নেতৃত্ব উন্নয়ন

Leadership Development

Humanitarian Aid and Civil Protection

National Alliance for Risk Reduction and Response Initiatives

actionaid

নেতৃত্ব উন্নয়ন

Leadership Development

Humanitarian Aid and Civil Protection

National Alliance for Risk Reduction and Response Initiatives

actionaid

নেতৃত্ব উন্নয়ন
Leadership Development

পরিকল্পনা ও নির্দেশনা
রাজকুমার গ্যাডে

গ্রন্থনা
সৈয়দ মোসাদ্দেক হোসেন
সাবরিনা সৈয়দ
মো: রেজাউল করিম
গ্যাডে জয়শ্রী

সহযোগিতা
একশন এইড ডিপিকো টিম

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১২

স্বত্ব
একশনএইড বাংলাদেশ

মুদ্রণ
আলপথ মিডিয়া
ই-মেইল: aalpoth.media@gmail.com
মোবাইল: ০১৭১২ ৫২৮৬৩৬

আর্থিক সহযোগিতায়
ইউরোপিয়ান কমিশন হিউম্যানিটারিয়ান এইড এন্ড সিভিল প্রটেকশন

এই গ্রন্থটি ন্যাশনাল এলায়েন্স ফর রিস্ক রিডাকশন এন্ড রেসপন্স ইনিশিয়েটিভ (NARRI) ওয়েবসাইট www.narri-bd.org এও পাওয়া যাবে। গ্রন্থটি অথবা এর অংশবিশেষ অন্য কোনো গ্রন্থে ব্যবহার অথবা পুণঃমুদ্রণ করতে হলে যা করা প্রয়োজন: ১. গ্রন্থটির প্রকাশক হিসাবে একশনএইড'র কৃতজ্ঞতা স্বীকার ২. গ্রন্থটি উন্নয়নে ইউরোপিয়ান কমিশন হিউম্যানিটারিয়ান এইড এন্ড সিভিল প্রটেকশন এর আর্থিক সহযোগিতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

ভূমিকা

নেতৃত্ব এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠী বা সংগঠন প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। একজন নেতা তার সংগঠন বা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি ও প্রত্যাশাকে ধারণ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন।

বাংলাদেশে ইউরোপিয়ান কমিশনের সাহায্যপুষ্ট NARRI কনসোর্টিয়াম এর ডিপিকো-৬ প্রকল্পের আওতায় 'নেতৃত্ব উন্নয়ন' বিষয়ক গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। যদিও একশনএইড বাংলাদেশ ডিপিকো প্রকল্পের আওতায় মডিউলটি প্রকাশ করতে যাচ্ছে, তবে NARRI কনসোর্টিয়ামের অর্ন্তভূক্ত অন্যান্য সদস্যসংস্থাসমূহও এই গ্রন্থটির পাঠ্যক্রম ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করেছে।

ইউরোপিয়ান কমিশন ফর ডিরেক্টরেট জেনারেল ফর হিউম্যানিটারিয়ান এইড (ডিজি-ইকো)'র অর্থায়নে একশনএইড বাংলাদেশ এর ডিপিকো টিম নেতৃত্ব বিষয়ক সাম্প্রতিক ধারণা অর্ন্তভূক্ত করে দুর্যোগ প্রস্তুতি কমিটির সদস্য এবং জনগোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য "নেতৃত্ব উন্নয়ন" বিষয়ক গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছে। গ্রন্থটি প্রণয়নের পরে দু'টি পৃথক এলাকায় ইউনিয়ন দূর্যোগ প্রস্তুতি কমিটির সদস্য, জনগোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে "নেতৃত্ব উন্নয়ন" প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মতামতের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থটি পর্যালোচনা ও পরিমার্জনা করা হয়েছে।

'নেতৃত্ব উন্নয়ন' বিষয়টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কর্মীদেরও ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য এক বিষয়, যার মধ্য দিয়ে চুড়ান্তভাবে সংগঠনও কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। গ্রন্থটি প্রণয়নে ইউনিয়ন দূর্যোগ প্রস্তুতি কমিটির সদস্য, জনগোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবকদের চাহিদা ও বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখে এর বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে।

একশন এইড ডিপিকো টিম

সূচীপত্র

১. নেতৃত্ব কী	০৫
২. নৈতিকতা ও নেতৃত্ব	১২
৩. নেতৃত্বে বৈচিত্র্যময়তা: সমতা, একীভূতকরণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার	১৭
৪. নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রক্রিয়া	২৪
৫. সামাজিক নেটওয়ার্ক ও নেতৃত্বের ভাবমূর্তি	৩০
৬. পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কী	৩৯
৭. নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	৪৭
৮. জয় জয় সমঝোতা	৫৩
৯. সিদ্ধান্ত গ্রহণে জ্ঞান ব্যবস্থাপনা	৬১
১০. নেতৃত্বে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	৬৫
১১. সম্পদ সমাবেশীকরণে নেতৃত্বের ভূমিকা	৭১
১২. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নেতার ভূমিকা	৭৭

নেতৃত্ব কী

নেতৃত্ব এমনই একটি প্রক্রিয়া যা কোনো একটি সমাজ বা সংগঠনকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। নেতা স্থানীয় সমাজ বা সংগঠনের চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতিকে ধারণ করেন, প্রভাবিত করেন ও পরিচালিত করেন। নেতাকে স্থানীয় সমাজ বা সংগঠন প্রভৃতির প্রতিনিধি ও মুখপাত্র নামে অভিহিত করা যায়।

নেতৃত্বের মূল বিষয়ই হলো সঠিক ব্যবস্থাপনা ও দলকে সক্রিয় করার মধ্য দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা। এর অর্থ আসলে এই যে অনুসারীরা নেতার দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হবেন এবং লক্ষ্য অর্জনে কাজ করবেন।

জন গার্ডনার নেতৃত্ব সম্পর্কে বলেন, "একজন নেতা এমনভাবে তাঁর লক্ষ্যকে লালন করেন ও প্রকাশ করেন যে, জনসাধারণ তাদের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ পূর্বধারণার গন্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ পরিশ্রম করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়।

নেতৃত্বের ধরন

সমাজবিজ্ঞানীগণ মানব সমাজে নেতৃত্ব দানরত বিভিন্ন নেতার বৈশিষ্ট্যের ধরন পর্যালোচনা করে মোটামুটি ছয় ধরনের নেতৃত্বকে চিহ্নিত করেছেন।

১. **ধর্মীয় নেতা:** মানব সমাজে প্রচলিত প্রায় সকল ধর্মের একজন মূল নেতা রয়েছেন। যেমন, মুসলমানদের হযরত মুহম্মদ (সাঃ), খ্রিষ্টানদের যীশুখ্রিষ্ট, বৌদ্ধদের বুদ্ধদেব। এদের পরেও দেশ ও যুগভেদে ধর্মীয় নেতা থাকেন।

২. **বংশানুক্রমিক নেতা:** রাজা, বাদশা, সম্রাট এ ধরনের নেতা। এদের বংশধরই পরবর্তী রাজা, বাদশা বা সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হতেন। এখনও পৃথিবীর অনেক দেশেই এ প্রথা বিদ্যমান আছে।

৩. **সামাজিক নেতা:** সমাজে এমন কিছু মানুষ আছেন, যারা স্বউদ্যোগে

এবং বিনা পারিশ্রমিকে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণে কাজ করে থাকেন, তাঁরাই সামাজিক নেতা। এদের কেউ কেউ তাদের কাজকে অধিকতর সুসংগঠিত উপায়ে পরিচালনার জন্য সমাজ কল্যাণমূলক সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করেন।

৪. **পেশাভিত্তিক নেতা:** পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বিভিন্ন পেশাভিত্তিক নেতা দেখা যায়। যেমন -দোকান মালিক সমিতির নেতা, হকার সমিতির নেতা প্রভৃতি।

৫. **গণনেতা বা রাজনৈতিক নেতা:** প্রতিটি রাজনৈতিক দলে কিছুসংখ্যক নেতা থাকেন। দলের ব্যাপ্তি অনুযায়ী নেতারও আধিক্য বা স্বল্পতা দেখা যায়। এরা গণমানুষ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে সাংসদ, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির দায়িত্বও পালন করেন। এরা নির্বাচনে পরাজিত হলেও গণনেতা ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখেন।

৬. **সাংগঠনিক নেতা:** মানব সমাজে বিরাজমান সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দই সাংগঠনিক নেতা। এনজিওর পরিচালকবৃন্দ, সমাজসেবী ক্লাবের পরিচালকবৃন্দ, সাংস্কৃতিক সংগঠনের পরিচালকবৃন্দ, প্রতিবন্ধী সংগঠনের পরিচালকবৃন্দ, ভূমিহীন দরিদ্র মানুষ কর্তৃক সংগঠিত দলের সভাপতি, সম্পাদকও এমনই নেতা।

গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নেতৃত্বকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১. গণতান্ত্রিক বা অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব

যদিও এ পদ্বতিতে নেতাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কিন্ত তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকল সদস্যের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করেন। কর্মকর্তা বা দলীয় সদস্যদের অংশগ্রহণের এই প্রক্রিয়া শুধু তাদের সন্তুষ্টিই বিধান করেনা, তাঁদের কর্মস্পৃহা বাড়ায় এবং কাজের প্রতি উৎসাহী করে তোলে। এ ধরনের নেতৃত্বের অধীনে যেহেতু প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে অংশীদার বিবেচনা করেন, সেহেতু প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যে কোন প্রচেষ্টা তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া যেহেতু সময়

সাপেক্ষ সেহেতু স্বৈরাচারী ধরনের নেতৃত্বে চেয়ে এই প্রক্রিয়ায় ফলাফল বিলম্বিত হতে দেখা যায়, কিন্তু পরিশেষে তা ইতিবাচক ফলাফল হিসাবে অর্জিত হয়।

২. এককেন্দ্রীক বা স্বৈরাচারী নেতৃত্ব

এককেন্দ্রীক বা স্বৈরাচারী নেতৃত্ব নেতৃত্বের এমন একটি ধরন, যেখানে নেতা তার অনুসারী সদস্যদের ওপর ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। এক্ষেত্রে অনুসারী সদস্যদের মতামত বা সুপারিশ রাখার সুযোগ থাকে নূন্যতম, এমনকি তা যদি দল বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণও করে। এধরনের নেতৃত্বের ফলে অধিকাংশ অনুসারী সদস্যই নেতৃত্বের প্রতি অসন্তষ্ট থাকেন এবং তাঁদের অনেকেই নতুন নেতৃত্বের সন্ধানে প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করেন। এককেন্দ্রীক বা স্বৈরাচারী নেতৃত্বের অধীনে সৃজনশীলতার সুযোগ থাকে না বলে প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে।

৩. আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব

আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব পুস্তককেন্দ্রীক; এ ধরনের নেতৃত্ব মনে করেন, প্রতিষ্ঠানের নীতিমালাই একমাত্র নির্দেশনা যা জনস্বার্থ, ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা পরিস্থিতি উপেক্ষা করেই বাস্তবায়ন করতে হবে। নিরাপত্তার ঝুঁকি সম্বলিত কাজ-যেমন, যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ, রাসায়নিক বিপজ্জনক পদার্থ নিয়ে কাজ কিংবা টাকা-পয়সার লেনদেন-সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব বা পরিচালনার এই ধরন বেশ কার্যকর। কিন্তু অন্যবিধ ক্ষেত্রে এধরনের নিয়ন্ত্রণ জনগণকে প্রতিষ্ঠানের বিরূদ্ধে অবস্থান নিতে উৎসাহিত করতে পারে এবং বাহ্যিক পরিবেশ-সৃষ্ট কোনো পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি মোকাবেলায়ও প্রতিষ্ঠানকে অসমর্থ করে তুলতে পারে।

নেতৃত্বের নতুন ধারনা: প্যারাডাইম শিফট ইন লিডারশীপ

নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে সেবক নেতৃত্ব একটি নতুন ধারণা। সেবক নেতৃত্ব হচ্ছে একটি ব্যবস্থাপনা দর্শন যা মানুষের যোগ্যতা, কাজ এবং সম্প্রদায়ের উৎসাহের উপর গুরুত্বারোপ করে। এর মাঝে পরিচয়, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং

পরিবেশের একটি উৎসাহমূলক উপলব্ধি বিরাজ করে। একজন সেবক নেতা প্রথমে একজন সেবক-পৃথিবীতে যার একটি দায়িত্ব রয়েছে এবং তিনি জনগণের ও সম্প্রদায়ের কল্যাণে অবদান রাখেন। একজন সেবক নেতা অন্যের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং নিজেকে প্রশ্ন করেন কীভাবে তিনি তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারেন ও তার পাশাপাশি আত্ম-উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। তার প্রধান শক্তি হচ্ছে জনগণ, কারণ শুধুমাত্র সংঘবদ্ধ এবং প্রণোদিত মানুষই তাদের লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হয় এবং প্রত্যাশা পূরণ করে থাকে। সেবক নেতৃত্ব হচ্ছে একটি ব্যবস্থাপনা দর্শন যা মানুষের যোগ্যতা, কাজ এবং সম্প্রদায়ের উৎসাহের উপর গুরুত্বারোপ করে। এর মাঝে পরিচয়, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং পরিবেশের উৎসাহমূলক উপলব্ধি বিরাজ করে। একজন সেবক নেতা প্রথমে একজন সেবক, পৃথিবীতে যাঁর একটি দায়িত্ব রয়েছে এবং তিনি জনগণের ও সম্প্রদায়ের কল্যাণে অবদান রাখেন।

The Servant as Leader প্রবন্ধে Greenleaf বলেছেন, সেবক নেতৃত্ব এমন একটা স্বভাবজাত অনুভূতির মাধ্যমে শুরু হয় যখন একজন সেবা প্রদানের লক্ষ্যেই সেবক হতে চায়। তাই সেবক নেতা অন্যান্য নেতাদের চেয়ে ব্যতিক্রম। কারণ পরিস্থিতি ও প্রয়োজনই তাঁকে নেতৃত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

নেতৃত্বের ধরনের ক্ষেত্রে সেবক নেতৃত্ব:

নেতৃত্বের ধরনের মধ্যে প্রধান বিভাজন হলো একনায়কতান্ত্রিক ও অংশীদারিত্বমূলক। ব্যবস্থাপনায় একনায়কতান্ত্রিক ধরন বলতে বুঝায় সুস্পষ্টভাবে কর্ম নির্দেশনা দেয়া এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা। সিদ্ধান্ত প্রণয়ন মূলত দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহীদের উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সহকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বড় বড় কাজগুলো অনেক বেশী প্রতিনিধিত্বমূলক হয়ে থাকে। এতে সহকর্মীদের প্রভাব এবং দায়িত্ববোধও বৃদ্ধি পায়।

সেবক নেতৃত্ব

জনগণের উন্নয়ন

সেবক নেতা জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণে কাজ করেন এবং নিজের কল্যাণের কথা চিন্তা না করে বরং নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অন্যের চাহিদা ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নেতৃত্ব প্রদান করেন। সেবক নেতা সব সময়ই নিজের কর্মদক্ষতা, আন্তরিকতা, সদিচ্ছা, মানুষের কল্যাণের প্রতি আগ্রহ এবং

সেবামূলক মানসিকতা দিয়ে মানুষের আনুগত্য অর্জনে সচেষ্ট হন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, মানুষের আনুগত্য অর্জন ছাড়া নেতৃত্ব অর্জন সম্ভব নয়।

বিশ্বাস যোগ্যতা প্রদর্শন

সেবক নেতৃত্ব জনগণের বিশ্বাস অর্জনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কারণ সেবক নেতা বিশ্বাস করেন যে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদর্শন করা না গেলে নেতৃত্ব পাওয়া যায় না।

নেতৃত্ব প্রদান

জনগণের বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম হলেই কোনো একজনের পক্ষে নেতৃত্ব প্রদান করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে তিনি নিজের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস কাজে লাগিয়ে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে জনগণকে এগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন।

নেতৃত্ব বন্টন

সেবক নেতা দ্রুত এবং কার্যকরভাবে কার্যসম্পাদনের জন্য যোগ্যতা ও দক্ষতানুযায়ী অনুসারীদের মধ্যে নেতৃত্বের দায়িত্ব বন্টন করে থাকেন। ফলে অনুসারীদের নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়িত্ব পালনে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

জনগণের মূল্যায়ন

জনগণই সেবক নেতার নেতৃত্বের বিষয়টি মূল্যায়ন করে থাকেন। তাই সেবক নেতা সব সময়ই সেবক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসরণ ও চর্চায় সচেষ্ট থাকেন।

একজন সেবক নেতৃত্বের বৈশিষ্টাবলী:

Larry C. Spears1 এর মতে সেবক নেতৃত্ব উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত সাত'টি বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন:

১. **শ্রবণ আগ্রহ:** ঐতিহ্যগতভাবে সেবক নেতৃত্বে নেতাকে যোগাযোগের দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ধার করতে হয়। একজন সেবক নেতৃত্বকে তার অধীনস্তদের কথা শোনা এবং তাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে সাহায্য করতে হয়। সেবক নেতাকে খুব গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য রাখতে হয় যেন নেতৃত্বের ব্যাপারে কোনো বিষয়ে ঘাটতি না থাকে।

২. **সহমর্মীতা:** একজন সেবক নেতার অন্যকে বুঝার মনস্তাত্ত্বিক ক্ষমতা থাকতে হবে এবং তাকে সহমর্মী হতে হয়। অনুসারীরা শুধু কর্মী নয় বরং মানুষ হিসেবে তাদের সম্মান এবং আত্ম-উন্নয়নের স্বীকৃতি দিতে হবে।

৩. **সমস্যা সমাধানে আগ্রহী:** সেবক নেতার অন্যতম গুণ হলো নিজের ও অন্যের সমস্যা নিরসন করা। একজন সেবক নেতা অন্যের সমস্যার সমাধান এবং শত্রুকে বন্ধুত্বে পরিণত করার চেষ্টা করেন, কারণ সে প্রতিটি ব্যক্তির আত্ম-উন্নয়নের লক্ষ্যে চেষ্টা এবং উৎসাহ প্রদান করে থাকেন।

৪. **সচেতনতা:** একজন সেবক নেতৃত্বের মধ্যে সাধারণ সচেতনতা বিশেষ করে আত্মসচেতনতা থাকতে হয়। তাঁর কোনো ঘটনাকে অনেক বেশি বিস্তৃত ও সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ক্ষমতা থাকতে হয়। যার ফলে তিনি নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে অনেক ভালোভাবে বুঝতে পারেন।

৫. **প্রণোদনা দানের ক্ষমতা:** একজন সেবক নেতা অন্যের সিদ্ধান্তকে তার ক্ষমতা কিংবা অবস্থার দ্বারা বাধাগ্রস্ত করে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেননা বরং সে তার অধীনস্ত সবাইকে বুঝানোর চেষ্টা করে থাকেন। এই গুণটি সেবক নেতৃত্বকে অন্যান্য নেতৃত্বের ধরন যেমন একনায়কতন্ত্র ধারণা থেকে আলাদা করে তোলে।

৬. **চিন্তাশীলতা:** একজন সেবক নেতা দৈনন্দিন বাস্তবতার বাইরেও চিন্তা করে থাকেন, তার মানে কোনো ব্যবস্থাকে স্বীয় সীমাবদ্ধতার বাইরে চিন্তা করা এবং ঐ ব্যবস্থার দূরবর্তী ফলাফল সম্মন্ধে ধারণা করার ক্ষমতাও একজন সেবক নেতার মাঝে বিদ্যমান থাকে।

৭. **দূরদর্শিতা:** দূরদর্শিতা হলো এমন একটি ক্ষমতা যেখানে কোনো একটি অবস্থার ফলাফলকে আগে থেকেই অনুধাবন করা হয়। এটি একজন সেবক নেতাকে অতীত থেকে শিক্ষা নেয়া এবং বর্তমান বাস্তবতা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। পাশাপাশি এটি ভবিষ্যৎ ফলাফল নির্ধারণের ক্ষেত্রেও একজন সেবক নেতাকে সক্ষম করে তোলে।

নৈতিকতা ও নেতৃত্ব

নৈতিকতা ও নেতৃত্ব বিষয়ক আলোচনায় সর্বাগ্রে যে বিষয়টি আলোচনার দাবী রাখে তা হচ্ছে- নৈতিকতা কী। নৈতিকতা শব্দটি যে কোনো সমাজে কিংবা প্রতিষ্ঠানেই বহুল প্রচলিত এবং আমরা প্রায়শঃই নিজ জনগোষ্ঠীর সদস্য, প্রতিষ্ঠানের সদস্য বিশেষত নেতৃত্বের কাছ থেকে আশা করা হয়ে থাকে। নৈতিক গুণসম্পন্ন নেতা একজন ব্যক্তিমাত্র নন, তিনি তার চেয়েও অধিক, যিনি গোটা প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ধারণ করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সঠিক কাজটিই করেন।

এখন জানা দরকার নৈতিকতা কী?

"নৈতিকতা" শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ বহন করে থাকে। কোন কাজটি নৈতিক এবং কোনটি নৈতিক নয় এই বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো নিয়ম নেই এবং নৈতিকতা ও অনৈতিকতা সংজ্ঞায়িত করা খুব সহজ ব্যাপারও নয়। নৈতিকতা শব্দটি ব্যাখ্যার মূল সমস্যা হচ্ছে, দেশভেদে এমনকি একই দেশে অঞ্চলভেদে আবার একটি দেশ বা অঞ্চলের নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে সময়ভেদে নৈতিকতার ব্যাখ্যা পরিবর্তীত হতে পারে। যেমন, প্রাচীনকালে জাপানে অতি বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি দায়-দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে সন্তানেরা তাদেরকে বরফাবৃত পাহাড়ে রেখে আসতো এবং সেখানেই তাঁরা প্রচন্ড ঠান্ডায় এবং খাদ্যাভাবে মৃত্যুবরণ করতেন। আমাদের দেশে এমনকি পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশেই চূড়ান্ত সমস্যাসংকুল সময়েও এধরনের কাজ অনৈতিক বলেই বিবেচিত। আবার সময়ের ব্যবধানে জাপানে এই প্রথা পরিবর্তীত হয়েছে।

নৈতিকতার সহজ ও সর্বোত্তম অর্থ হচ্ছে "সততা"। নৈতিকতা আধুনিক অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধান অনুসারে- "নৈতিকতা-যা নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত অথবা জ্ঞানের ঐ শাখা যা নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে কাজ করে"

পশ্চিমা নৈতিক দর্শনের মূলভিত্তি হচ্ছেঃ

১. এটি একটি গুণ যা ব্যক্তি এবং ব্যক্তি সমাজকে উপকৃত করে, যেমন ন্যায়বিচার, বদান্যতা এবং উদারতা।

২. এটি হচ্ছে একটি দিক নির্দেশনামূলক নীতিমালা যার পরিচালনার মূল ভিত্তি হচ্ছে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সুখ।

নৈতিকতা এবং আইন

অনেকেই বিশ্বাস করেন নৈতিকতা শব্দটি আইনের সমার্থক। কিন্তু অনেক বিষয় যা অনৈতিক কিন্তু আইনত ঠিক সেক্ষেত্রে নৈতিকতা আইনের সমার্থক নয়। আবার অনেক অনৈতিক বিষয়ই পুরোপুরি আইনত (তদুপরি কখনো কখনো আইন সর্বোচ্চ অনৈতিক কোনো ফলাফল বয়ে আনতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাসে অনেক বেশি লক্ষ্য করা যায়, যেখানে শেষ পর্যন্ত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আইনে পরিণত করা হয়েছে; যেমন- আমেরিকাতে সাদা বর্ণের মানুষের মতই কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের সমানাধিকার। সমগ্র বিশ্বেই পশ্চিমা আধুনিক মানবাধিকার তত্ত্ব অনুযায়ী নৈতিক মূল্যবোধসমূহ আইনে রূপান্তরিত হচ্ছে। কখনো কখনো সমাজের অভ্যন্তরস্থ মিথস্ক্রিয়ার দরুণ শাসকবৃন্দ আইনকে পরিবর্তন করছেন, কখনো কখনো শাসকবৃন্দ সামাজিক বা রাজনৈতিক চাপে তা করছেন। শেষ পর্যন্ত নৈতিকতা বিষয়টি যে কোনো দেশ ও সমাজেই আইনের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আইনগতভাবে অবৈধ কাজ সব সময় অনৈতিক নয় আবার নৈতিক কাজও সব সময় আইনত বৈধ নয়। তাই বলা যায় যে আইনগত বিষয় নৈতিকতার সমার্থক নয় এবং অনৈতিকতাও আইনত অবৈধের সমার্থক নয়।

নৈতিকতা এবং ধর্ম

অধিকাংশের মতে নীতি এবং নৈতিক বিচার ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে ধর্ম কখনোই একটি সঠিক মানের নীতিতে পৌঁছানোর মাধ্যম নয় বরং আইনের প্রাধান্যই এখানে বেশি। এমন একটা সময় ছিলো যখন ধর্ম আইনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হতো। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে দেশে দেশে এই প্রবণতা ক্রমেই কমছে। এখনো

আমাদের দেশে সম্পত্তি ও পারিবারিক আইনের প্রধান ভিত্তি ধর্মীয় আইন, যদিও ফৌজদারী অপরাধ আইন ধর্মীয় ভিত্তিতে নয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় সম্পত্তি ও পারিবারিক আইনের ভিত্তি হিসাবে ধর্মীয় আইনের প্রাধান্য হ্রাস পেয়েছে এবং পারিবারিক আইন ক্রমেই সময়ের চাহিদা পূরণ করছে; যেমন, আমেরিকার বেশীরভাগ মানুষ খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী এবং এই ধর্ম একই লিঙ্গ অর্থাৎ নারী-নারী বা পুরুষ-পুরুষ শারীরিক সম্পর্ক বা বিবাহ অনুমোদন না করলেও আইন তা অনুমোদন করছে।

নৈতিকতা এবং জনমত

কখনো কখনো মনে করা হয় যে, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অথবা প্রভাবশালী অংশ যে সকল বিষয়কে সঠিক ও ন্যায্য বলে মনে করেন, ঐ সমাজের জন্য তাই নৈতিক। কিন্তু এটি সঠিক নয়। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অথবা প্রভাবশালী অংশ সংখ্যালঘিষ্ঠ কিংবা পিছিয়ে পড়া অংশের দৃষ্টিভঙ্গি উপেক্ষা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিশ্বাস ও মূল্যবোধকেই নৈতিক হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন; যা মূলত অনৈতিক। বরং সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ কিংবা পিছিয়ে পড়া অংশের দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করার দৃষ্টিভঙ্গিই নৈতিক। সুতরাং বলা যায়, নৈতিক বিবেচনা সব সময় সংখ্যাগরিষ্ঠের দর্শন দ্বারা নির্ধারিত নয়, যেমনিভাবে ধর্ম কিংবা আইনের দ্বারাও নয়।

নৈতিকতা ও নৈতিক নেতৃত্ব

নেতা একদিকে নৈতিক কাজটি করে প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবদান রাখেন, সংগঠনে এমন এক পরিবেশ তৈরীতে অবদান রাখেন যেখানে প্রতিষ্ঠানের অপরাপর সদস্যবৃন্দও নৈতিক কাজটি করে প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারেন। অর্থাৎ নৈতিকতার মানদন্ডে উত্তীর্ণ নেতার ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক কর্মকান্ড অপরাপর সদস্যবৃন্দকেও সঠিক কাজটি করতে অনুপ্রাণিত করে। নেতা একদিকে নৈতিক কাজটি করে প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবদান রাখেন, সংগঠনে এমন এক পরিবেশ তৈরীতে অবদান রাখেন, যেখানে প্রতিষ্ঠানের অপরাপর সদস্যবৃন্দও নৈতিক কাজটি করে প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন ও লক্ষ্য

বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারেন এবং নৈতিকতার মানদন্ডে উত্তীর্ণ নেতার ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক কর্মকান্ড অপরাপর সদস্যবৃন্দকেও সঠিক কাজটি করতে অনুপ্রাণিত করে। নৈতিক নেতৃত্ব সর্বদাই সততা, ন্যায়বিচার অনুকরণীয় দৃষ্টান্তের প্রতীক।

একজন নৈতিক গুণসম্পন্ন নেতা হতে চাইলে নিজের সম্পর্কে এ প্রশ্নগুলো করে দেখতে হবে:

১. আমি কি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছি?

২. আমি কি প্রতিষ্ঠানের আইন অনুযায়ী সকলের প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে সুবিচার করছি?

৩. আমি কি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সকলের কর্মপযোগী পরিবেশ তৈরীতে অবদান রাখছি?

৪. আমি কি নৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছি?

৫. আমি কি সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রভাবশালী অংশের অন্যায় মতামত উপেক্ষা করে নির্মোহ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম?

৬. আমার কর্মকান্ড কি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সংখ্যালঘিষ্ঠ ও পিছিয়ে পড়া অংশের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসে আঘাত করছে?

৭. আমি কি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মূল্যবোধ ও বিশ্বাস এর সাথে সংখ্যালঘিষ্ঠ ও পিছিয়ে পড়া অংশের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্ত করে সিদ্ধান্ত নিতে পারছি?

৮. আমি কি প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগতভাবে সৎ?

৯. আমি কি আত্মমূল্যায়ন করতে সক্ষম এবং আত্মমূল্যায়নে অধীনস্তদের মতামত মূল্যায়ন করি?

১০. আমি কি প্রতিষ্ঠানে এমন কিছু করছি যা অনুকরণীয়?

নৈতিক নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ

নৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় যে কোনো নেতাকে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়, তা হচ্ছে,

১. ব্যক্তিগত লোভ ও স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

২. ব্যক্তিগত সুবিধা উপেক্ষা করা।

৩. অধীনস্তদের মতামত মূল্যায়ন করে আত্মমূল্যায়ন করা।

৪. সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রভাবশালী অংশের অন্যায় মতামত উপেক্ষা করে নির্মোহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৫. সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মূল্যবোধ ও বিশ্বাস এর সাথে সংখ্যালঘিষ্ঠ ও পিছিয়ে পড়া অংশের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্ত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

নেতৃত্বে বৈচিত্র্যময়তা: সমতা, একীভূতকরণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার:

প্রতিটি সমাজে বৈচিত্র্য থাকে তবে বৈচিত্র্য যদি বৈষম্যের কারণ হয় তখন একীভূত সমাজ প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে, আর তা সম্ভব ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সমাজে সমতা ফিরিয়ে এনে। তাই বৈচিত্র্যময়তা, সমতা, একীভূতকরণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য নেতৃত্বের উদ্দেশ্য হলো সমাজের নেতিবাচক দিকগুলো কমিয়ে আনা বা সমাজ থেকে এর মূলোৎপাটন করা। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা ক্রমশই বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে যেখানে সমতা ও একীভূতকরণ এবং মানব কল্যাণের মাঝে একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

বৈচিত্র্যময়তা কী

বৈচিত্র্যময়তার শাব্দিক অর্থ হল একাধিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু যখন এটাকে সমতার বিপরীতে ব্যবহার করা হয়, তখন বোঝা যায় সেখানে ব্যক্তি বা একদল মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোঝানো হচ্ছে। এই পার্থক্য হতে পারে লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, রাজনৈতিক বিশ্বাস, আদর্শ, শারীরিক সক্ষমতা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে। তবে এই পার্থক্যগুলো অভিযোজন করার নামই হলো বৈচিত্র্যময়তা। কিন্তু যখন কোনো বিশ্বাসে বা কর্মকান্ডে বৈচিত্র্যময়তাকে আমরা মেনে নিতে পারি না তখনই সমাজে দেখা দেয় বৈষম্য পূর্ণ অবস্থা।

সমাজে বৈচিত্র্যময়তার প্রয়োজন আছে, কেননা বৈচিত্র্যময়তার কারণেই একটি সমাজ বা সংস্কৃতি থেকে অন্য একটি সমাজ বা সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় ফলে প্রতিটি সমাজ বা সংস্কৃতিই অনন্য সাধারণ হয়ে বিশ্বে টিকে থাকে এবং বৈচিত্র্যময়তাই পারে নতুন জ্ঞান ও পরিবর্তন এনে সমাজ এবং বিশ্বকে সমৃদ্ধ করতে।

সমতা

বৈচিত্র্যময়তা হলো সেই স্বীকারোক্তি, যেখানে সমাজের বিভিন্নতাকে সম্মান

দেখানো হয় আর সমতা হলো সেই বিশ্বাস ও ব্যবস্থা যেখানে সমাজের সকল পর্যায়ে ব্যক্তির সুযোগ, প্রবেশাধিকার, অংশগ্রহণ এবং অবদান নিশ্চিত করা হয়।

Equality is the current term for 'Equal Opportunities.' It is based on the legal obligation to comply with anti-discrimination legislation. Equality protects people from being discriminated against on the grounds of group membership

সমতা বলতে আমরা বুঝি এমন একটি সমাজ যেখানে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই, যেখানে সকলে সমান অধিকার এবং সমান সুযোগ পায়। সমাজের সকল বৈচিত্র্যময়তাকে মেনে নেয়ার প্রথম পদক্ষেপ হলো সমাজে সমতা বিধান প্রতিষ্ঠা করা। সকল ভেদাভেদ উপেক্ষা করে একত্রে বসবাস ও কাজ করা।

একীভূতকরণ

সমাজে সমতা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন কার্যকর একীভূতকরণ। একীভূতকরণ হলো সমাজের বৈচিত্র্যময়তাকে অপরিবর্তিত রেখে গ্রহণ করা এবং সম্মান করা। ভিন্নতা হলো একটি ধারণা যার মাধ্যমে বৈচিত্র্যময়তাকে স্বীকার করা হয় এবং সাম্য ও সমতার ভিত্তিতে একীভূতকরণ নিশ্চিত করা হয়। যদিও এই ধারণাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেয়া হলে ভুল করা হবে তবে একে সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক আধিপত্যের ফসল হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

ন্যায়বিচার

বৈচিত্র্যময়তা বা বিভিন্নতা থেকে সমাজে সৃষ্টি হতে পারে বৈষম্যের আর বৈষম্য হলো সামাজিক ন্যায়বিচারের একটি বিপরীত ধারণা। ন্যায়বিচারের এই ধারণা এবং গুরুত্বের গভীরতা উপলব্ধি করতে পেরে আইনের সহায়তায় একে সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কখনো কখনো আইনকেই ব্যবহার করা হয় ন্যায়বিচারের বিপক্ষে। তবে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আইনগত অধিকার অর্জনে যখন বৈষম্য দেখা দেয় তখন সামাজিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই সমাজে সমতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

মানবিক দিকগুলো বিবেচনা করেই আইনের শাসনে মৌলিক নীতিমালাগুলো নির্ধারিত হয় যা সকল সম্প্রদায়ের সকল অধিকারের জন্য প্রযোজ্য। সামাজিক সমতার জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা যতটা সহজ ঠিক ততটাই কঠিন মানুষের শারীরিক এবং মানসিক সমতার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

সমাজে সমতা, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার পাশাপাশি অবস্থান করে। একীভূতকরণ এবং সমতা কোনো ধরনের দয়া বা সততা নয়, এগুলো মানবাধিকার, ন্যায়বিচার এবং আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের জন্মগত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব। সামাজিক ন্যায়বিচার একটি গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা শর্তহীনভাবে একীভূতকরণের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। সকল সমাজেই সামাজিক বৈষম্য বিদ্যমান। আভিজাত্যবোধ, কুসংস্কার, লোভ এবং অসমতার অনুভূতি থেকেই তৈরি হয় সামাজিক বৈষম্য। আর এই ধারণা জন্ম দেয় একটি নিপীড়িত শ্রেণীর, যারা অবহেলিত, বঞ্চিত এবং হতাশাগ্রস্থ।

আইনের দৃষ্টিতে সমতার ধারণাকে মানুষের সকল কাজের ভিত্তিতে বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে মানবতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো অবহেলিত হয় না, অন্য দিকে বৈচিত্র্যময়তা হলো প্রাকৃতিক বিভিন্নতাকে গ্রহণ করে সকল মানব জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক একীভূতকরণ ও সমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একত্রে কাজ করা। এটা শুধুমাত্র সমতার ধারণাকে মানব সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বোঝায় না, পাশাপাশি কিছু মৌলিক নীতির সাথেও অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। সমতার ধারণা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, সমাজ থেকে কিছু পেতে হলে সমতা অর্জন করতে হবে। মানবশিশু জন্ম থেকে ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা নিয়ে আসে তাই সকলের সাথে সমান আচরণের মাধ্যমেই সমতা আসবে তা বলা যায় না।
একথা অনস্বীকার্য যে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো সেখানে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং আইনের চোখে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান কোনো বিশেষ গুরুত্ব পায় না। সামাজিক ন্যায়বিচারও সমাজের অন্য কোনো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। সমাজে যেখানে

অসমতার ধারণা গ্রহণযোগ্য সেখানে যেকোনো সময় অন্ধকার নেমে আসতে পারে তাই সমতা এবং সাম্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অতীব জরুরী।

উপরের চিত্র থেকে সহজেই বোঝা যায়, সামাজিক ন্যায়বিচার যেখানে বিদ্যমান সেখানে একই সাথে সাম্য এবং সমতা বিরাজ করে। এতে আরো প্রতীয়মান হয় যে, সাম্য ও সমতা যত বেশি পাশাপাশি অবস্থান করে সেখানে সামাজিক ন্যায়বিচার তত বেশি বিদ্যমান।

সমতা: প্রতিটি মানুষের সমান মর্যাদা, শ্রদ্ধা ও সমাজের সুযোগ সুবিধা পাবার সমান অধিকার
সাম্য: প্রতিটি মানুষের চাহিদাভিত্তিক সামাজিক সুযোগ-সুবিধা পাবার অধিকার
সামাজিক ন্যায়বিচার: সাম্য ও সমতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

যখনই আমরা সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা বিবেচনা করি তখন যখনই আমরা সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা বিবেচনা করি তখন সমতা, সাম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচারের নীতি আমাদের দু'টি মৌলিক ধারণার দিকে ধাবিত করে- এক, অত্যাচার থেকে মুক্তি মানেই সামাজিক ন্যায়বিচারের উপস্থিতি নয়। সেখানে সামাজিক ন্যায়বিচার থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। একইভাবে সেখানে বৈচিত্র্যময়তার প্রতি শ্রদ্ধা কিংবা স্বীকৃতি থাকতেও

পারে, নাও থাকতে পারে। দুই, এই নীতি সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রতিটি মানুষের জীবনের জন্য প্রযোজ্য। একজন ব্যক্তি আইনের আওতাধীন হতেও পারেন, নাও হতে পারেন, যদি তারা আইনের আওতাধীন হয় তার মানে হচ্ছে তাদের জন্য আইনের নিরাপত্তা আছে। সামাজিক ন্যায়বিচার কোনো বিশেষ বা অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য প্রযোজ্য নয়, এটি মানব জীবনের প্রতিটি স্তরের জন্য সত্য। সামাজিক ন্যায়বিচার আমাদের তত্ত্বগত কাঠামো থেকে বাস্তবক্ষেত্রে ধাবিত করে যা ব্যক্তিকে সমান ভোটাধিকার, সংঘবদ্ধ হবার অধিকার এবং বিতর্কের অধিকার প্রদান করে। সামাজিক ন্যায়বিচার আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের একটি বিষয় সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, আর তা হলো প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব অধিকার। সেখানে মানবাধিকারের কোনো মাত্রা থাকতে পারে না এবং প্রতিটি মানুষের নিজস্ব পরিচয় এবং একাত্মতার ক্ষেত্রে কোনো শর্ত থাকতে পারে না। মানব মর্যাদাকে মানবিক দিক থেকে উপলব্ধি করতে হবে, সেখানে কোনো কৃত্রিম কাঠামো বা আদর্শিক কাঠামো থাকবে না। মানবিক মর্যাদার ক্ষেত্রে কোনো সচেতনতা, আপেক্ষিক সম্পদ বা সামাজিক মর্যাদার সাথে আপোষ করা যাবে না।

এমন কোনো আপেক্ষিক ধারা নেই যার মাধ্যমে মানব সম্প্রদায়কে বিজ্ঞান সম্মতভাবে, আইনগতভাবে বা নীতিগতভাবে বিভাজন করা সম্ভব। তাই লিঙ্গ, গোত্র, প্রতিবন্ধীতা, বুদ্ধিমত্তা, শারীরিক ভিন্নতা, শিল্পবোধ, ভাষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা মানুষে মানুষে পার্থক্য তৈরি করে ঠিকই কিন্তু তা বৈষম্যের উপাদান হতে পারে না। আর এ কথা স্বীকার করে নিতে পারলেই সম্ভব বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা ধরে রাখা এবং একীভূতকরণ নিশ্চিত করা।

নেতৃত্বে বৈচিত্র্য ও একীভূতকরণ

একজন সফল নেতা সব সময় বৈচিত্র্যময়তাকে গুরুত্ব দেয়। তিনি শ্রম দেন বৈচিত্র্য নিশ্চিত করার জন্য, পাশাপাশি তার অধীনস্তদের উৎসাহী করেন বৈচিত্র্যময়তা ধরে রাখার জন্য। দলের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকলে সহযোগিতার মনোভাব এবং সৃজনশীলতা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বাড়ে। পাশাপাশি যেকোনো কর্মকান্ডে বৈচিত্র্যময়তা বিবেচনা করে অগ্রসর হলে সফলতা পাবার সম্ভাবনাও সুনিশ্চিত হয়।

নেতৃত্বে বৈচিত্র্যময়তা অঙ্গীভূতকরণের জন্য নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন যা সামাজিক জীবন ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র পরিস্থিতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল:

১. আত্মোপলোব্ধি, মূল্যবোধ, আত্মমর্যাদা, একাত্মতা।
২. শ্রদ্ধাবোধের সমতা।
৩. অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা এবং সংবেদনশীলতা।
৪. ভিন্নতাকে স্বীকার করা ও তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ।

একজন সফল নেতা তিনিই যিনি চিন্তাশীল এবং প্রচলিত নিয়ম নীতির বাইরে যেয়ে চিন্তা করতে পারেন, পাশাপাশি দলের সকলকে সেভাবে চিন্তা করতে উৎসাহি করেন। যখন কোনো নেতা এই গুণাগুণ অর্জন করতে সক্ষম হন তখন তার মধ্যে গড়ে ওঠে টেকসই নেতৃত্বের গুণাবলী। নেতৃত্বের বৈচিত্র্যময়তাকে স্বীকার করা এবং ভিন্নতাকে গ্রহণ করে একীভূতকরণের মাধ্যমে সমাজে ভারসাম্য রক্ষা করা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যখন একজন নেতা তার কর্মকান্ডে সমাজের বৈচিত্র্যময়তাকে গ্রহণ করেন এবং সকল স্তরের ও সকল শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের কথা বিবেচনা করে পরিকল্পনা করেন তখন নেতৃত্বে একীভবনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। একীভূতকরণ পদ্ধতি বিভিন্ন ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর শুধু বৈচিত্র্যময়তাকেই সম্মান করে না, তাদের মতামতকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এর ফলে সমাজে একটি শান্তিপূর্ণ, স্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি হয় যেখানে প্রত্যেকে সাবলীলভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সেই সাথে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত বিভিন্ন নেতিবাচক ও বৈষম্য নির্দেশক ভাষা ও কর্মকান্ডকে পরিহার করতে পারে। এই ধারণাটি মানুষের সার্বিক উন্নয়নের আস্থা ও সমঝোতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কমিউনিটি পর্যায়ে আমরা যেসকল বৈচিত্র্যপূর্ণ জনগোষ্ঠী বা ব্যক্তিবর্গ দেখতে পাই তারা হলেন- নারী, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী, ধর্মীয় দিক থেকে সংখ্যালঘু ও পেশার দিক থেকে সংখ্যালঘু। একজন নেতার প্রথম কাজ হলো সমাজের বৈষম্যের বিরুদ্ধে কাজ করা এবং বৈষম্য দূরীকরণে যে সকল আইন ও নীতিমালা রয়েছে সেগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা, যাতে যেকোনো কর্মকান্ডে একীভূতকরণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। আর যখন একজন নেতার আচরণে এই ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে তখন বোঝা

যাবে, তাঁর নেতৃত্বে এই ধারণা সফলভাবে সংযোজিত হয়েছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময়তা সকলের কাছে তুলে ধরতে হবে, সকলের মধ্যে মূল্যবোধ তৈরি করতে হবে যাতে একীভূতকরণ সহজ হয়। একীভূতকরণে সফলতা অর্জনের প্রয়াসে সমাজে ন্যায়বিচারের প্রচলন ঘটানো খুবই প্রয়োজনীয় যা অর্জন করা সম্ভব বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমতা বিধান এর মাধ্যমে।

নেতৃত্বে বৈচিত্র্যময়তাকে ধরে রাখার জন্যে একজন নেতাকে যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা হলো–

- সমাজের বৈচিত্র্যময়তা চিহ্নিত করতে হবে।
- যে সকল বৈচিত্র্যের কারণে বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- সমাজের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে হবে যেন সমাজ বৈষম্যের অন্ধকার ছায়া থেকে মুক্তি পায়।
- নেতৃত্ব প্রদানের সময় সকল স্তরের সকল ব্যক্তির সক্ষমতা ও অক্ষমতা বিবেচনা করে কর্মকান্ড নির্ধারণ করতে হবে।
- মনে রাখতে হবে ব্যক্তির বিশেষ চাহিদা ব্যক্তির অক্ষমতা হতে পারে না, তাই সকল ব্যক্তি সামাজিক কর্মকান্ডের অংশ হতে পারে।

নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রক্রিয়া

প্রাতিষ্ঠানিক বা দলীয় সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি হলো ব্যতিক্রমধর্মী নেতৃত্ব। সে সকল প্রতিষ্ঠান সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছে তারা তাদের প্রতিষ্ঠানের বা দলের ভেতরে নেতৃত্ব উন্নয়নের চেষ্টা করেছে এবং দক্ষতার সাথে উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হয়েছে। আর অন্য দিকে যে সকল প্রতিষ্ঠান নেতৃত্ব উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব দেয়নি তারা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার সামর্থ্য হারিয়েছে। সফল প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু যে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের নেতৃত্বের উন্নয়ন ঘটায় তাই নয় বরং সকল পর্যায়ের নেতা ও কর্মীদের নেতৃত্বেরই উন্নয়ন সাধন করে। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন স্তরে পাওয়া যায় বেশ কিছু অসাধারণ নেতা যাঁরা প্রতিষ্ঠান বা দলের সকল কর্মীদের নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধনের জন্য আন্তরিক থাকেন।

সফল প্রতিষ্ঠান সব সময়ই নেতৃত্বের সঠিক মূল্যায়ন করে এবং প্রতিষ্ঠান ও দলের ভিতরে এমন একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলে যেখানে নেতৃত্ব তৈরী ও নেতৃত্বের বিকাশ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রতিষ্ঠানগুলো নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোর জন্য সক্রিয়ভাবে সময় দেয় এবং অর্থ ও সম্পদ ব্যয় করতেও কোনো কার্পণ্য করে না। যেসকল প্রতিষ্ঠান সফলতার চরম শিখরে পৌঁছায় তাদের রয়েছে ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি। সেই ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নেতৃত্ব পর্যায়ে যাঁরা আছেন তারা শুধু ব্যবস্থাপনার কাজ করেন না বরং সকল স্তরে তাঁরা তাঁদের নেতৃত্বের জন্য জবাবদিহিও করেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় সাধারণ প্রতিষ্ঠান ও সফল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উলেখযোগ্য পার্থক্য হলো সকল স্তরের নেতৃত্বের গুণাবলীর পার্থক্য যা প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতির এক বিশেষ অংশ। তাই প্রতিষ্ঠানের সফলতার জন্য কিছু নেতা তৈরিই যথেষ্ট নয় বরং সেই নেতাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে, তাঁরা সকল স্তরে তাদের নেতৃত্বের জবাবদিহিতায় বাধ্য থাকবেন। আর দলের সফলতার জন্য এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু ভালো ব্যবস্থাপক বা পরিচালক আছে ঠিকই, কিন্তু ভালো নেতা নেই

বা সেই ব্যবস্থাপকের মধ্যে সঠিক নেতৃত্বের গুণাগুণ নেই। তবে সাম্প্রতিক কালে প্রতিষ্ঠান সমূহ বুঝতে শিখেছে যে, ব্যবস্থাপক আর নেতার মধ্যে পার্থক্য আছে। সহজভাবে বলতে চাইলে বলা যায় ব্যবস্থাপক বা পরিচালক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি তার প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত। আর নেতা হলেন তিন্নিযিনি প্রশিক্ষক, পরামর্শদাতা এবং তার অধীনস্তদের অনুপ্রাণিত ও উন্নয়ন সাধনে সক্ষম।

আরো দেখা যায় যারা নেতার আসনে বসে আছেন তারা আসলে কারো কাছেই জবাবদিহি করতে বাধ্য নন যদিও এই জবাবদিহিতা নেতার গুণাবলী দৃঢ় করতে সহায়তা করে।

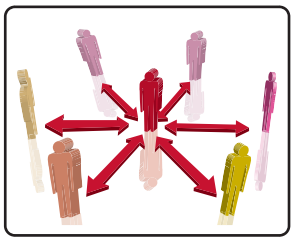

নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধনের জন্য সঠিক বা সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই। Ulrich, Zenger এবং Smallwood “Result Based Leadership” বইয়ে লিখেছেন কিভাবে একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান তাদের অভ্যন্তরিন সকল স্তরে নেতৃত্বের উন্নয়ন ঘটিয়েছে।

- প্রথমত, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁরা তাদের দলের নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধন করবেন।
- দ্বিতীয়ত, তাঁরা খুঁজে বের করেছেন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব।
- তৃতীয়ত, তাঁরা নেতৃত্বের মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন। এই মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছিল বিশ্বের সফল নেতাদের গুণাগুণ পর্যালোচনা করে।
- সবশেষে তাঁরা সকল নেতাদের জন্য জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া চালু করেছিলেন এবং ব্যবহার করেছিলেন ৩৬০ ডিগ্রী ফিডব্যাক প্রক্রিয়া।

৩৬০ ডিগ্রী ফিডব্যাক প্রক্রিয়া কী

৩৬০ ডিগ্রী ফিডব্যাক প্রক্রিয়া হলো সেই প্রক্রিয়া যেখানে প্রত্যেক নেতা তার কর্মের জন্য সকল স্তরের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য এবং বিভিন্ন স্তরের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফিডব্যাক নেতার নেতৃত্বের গুণাগুণকে আরো দৃঢ় করে।

নেতৃত্বের উন্নয়ন মানে নিজের উন্নয়ন

নেতা হবার জন্য রহস্যময় গুণাবলী অথবা জন্মগত গুণাগুণ থাকার প্রয়োজন নেই, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন নিজেকে জানা এবং নিজের দক্ষতা সম্পর্কে জানা। প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বের উন্নয়ন হলো নিজের উন্নয়ন। প্রতিদিনের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের উন্নয়নের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ, অন্যের কাছ থেকে বা অভিজ্ঞতা থেকে নিজের সক্ষমতা সম্পর্কে জানা এবং নিজ সম্পর্কে অন্যের ধারণা ও মতামত এবং অন্যের পরামর্শ শুনে নিজের উন্নয়ন নিশ্চিত করার নামই হলো নেতৃত্বের উন্নয়ন।

নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধনের অন্যতম অপরিহার্য কাজ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া চালু করা যা ব্যক্তিকে নেতৃত্ব উন্নয়নের জন্য সহায়তা করবে এবং তাকে সঠিক পরামর্শ দেয় যাতে সে নিজেকে নেতা হিসেবে গড়ে তোলার সকল সুযোগ পায়। নেতৃত্বের উন্নয়নের জন্য কোনো কাজই ততোটা কার্যকর নয় যতটা কার্যকর সঠিক ফিডব্যাক। বহু প্রতিষ্ঠান সে কারণেই উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একক মূল্যায়ন পরিহার করে ৩৬০ ডিগ্রী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চালু করেছে, যাতে কাজের সঠিকতা ও বৈধতা বৃদ্ধি পায়। নেতৃত্ব উন্নয়নে ৩৬০ ডিগ্রী ফিডব্যাক প্রক্রিয়া বেশি কার্যকর এবং পরিমাপযোগ্য, যা নেতাদের আচরণের সঠিক বিচার করতে সক্ষম।

ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে নেতৃত্ব প্রদানের গুণাগুণ অর্জন ও উন্নয়নের জন্য আচরণগত পরিবর্তন খুবই প্রয়োজন কিন্তু তা বেশ কষ্টসাধ্য। তাই বিভিন্ন দল ৩৬০ ডিগ্রী ফিডব্যাক বা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ব্যক্তির নেতৃত্বের

উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করে কেননা নেতৃত্বের উন্নয়ন দলের রীত্মিনীতি ও সংস্কৃতির সাথে জড়িত এবং এ প্রক্রিয়া ব্যক্তির পেশাগত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও চলমান পরামর্শের সাথেও সম্পর্কযুক্ত। ৩৬০ ডিগ্রী নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রক্রিয়া একেক দল একেকভাবে অনুসরণ করে।

এই পর্যায়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে, যেখানে সকল প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব পর্যায়ের সকলেই উপস্থিত থাকবেন। আলোচনা সভায় তাঁরা ঔক্যমতে পৌঁছবেন যে, ৩৬০ ডিগ্রী নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়, কিভাবে এটা কাজ করে, আর কিভাবে এটা পেশাগত জীবনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যাঁরা সত্যই নেতৃত্ব উন্নয়নে আগ্রহী তাঁরা খুব সহজেই ৩৬০ ডিগ্রী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়া থেকে লাভবান হবার উপায় বুঝে ফেলেন। ফলে তারা এই প্রক্রিয়া চালু করার জন্য আগ্রহী হন। আর অন্য দিকে যাঁদের নেতৃত্বের গুণাবলী সবল করার জন্য কাজ করতে হবে তাঁরা চুপ থাকেন এবং এই প্রক্রিয়ার সাথে সহজে একমত পোষন করেন না।

অধিকাংশ সফল প্রতিষ্ঠানই বছরে অন্তত একবার ৩৬০ ডিগ্রী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ভিত্তিক একটি মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, কেননা নেতৃত্বের দক্ষতা সৃষ্টির কোনো সহজ উপায় নেই। এটা সবসময়ই একটি দীর্ঘমেয়াদী চলমান প্রক্রিয়া।

নেতৃত্ব উন্নয়নের পদ্ধতি এবং কৌশল

ভালো নেতৃত্ব কতৃত্বের ধারণার চেয়ে গভীর মানবিক গুণাবলীর উপর বেশি গুরুত্বারোপ করে। আধুনিক যুগে ভালো নেতৃত্ব বলতে এমন একটি শক্তিকে বুঝায় যা ব্যক্তি বা সংগঠনের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে। ফলশ্রুতিতে জনগণের চাহিদা এবং ঐসমস্ত সংগঠনের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে একটি আধুনিক জোট গড়ে উঠে।

নেতৃত্বের প্রথাগত সংজ্ঞা যেখানে নেতৃত্বকে একটি সর্বোচ্চ স্তরে স্থান দেয়া হয় যা আজকাল ভালো নেতৃত্বের সংজ্ঞার কাছে খুবই অগ্রহণযোগ্য। কার্যকারী নেতৃত্ব বলতে শুধুমাত্র দক্ষ কারিগরি এবং বুদ্ধিভিত্তিক ক্ষমতাকে

বুঝায় না বরং এগুলো ভালো নেতৃত্বের কার্যে সাহায্য করে থাকে। আধুনিক যুগে ভালো নেতৃত্ব বলতে বুঝায় নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবহার যা মানবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সেবা প্রদান করা হচ্ছে নেতৃত্বের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। যেখানে ভালো নেতৃত্ব তার অধীনস্থ সকল ব্যক্তি এবং সংগঠনকে সেবা প্রদান করে, সেখানে অকার্যকরী নেতৃত্ব সাধারণত এই সেবা প্রদান করাকে উপেক্ষা করে এবং তারা এই নীতিতে বিশ্বাস করে যে জনগণ নেতৃত্বের সেবা করবে। তাদের কাছে নেতৃত্ব হচ্ছে একটি সুযোগ যার মাধ্যমে একজন নেতা অন্যের দ্বারা নিজের ব্যক্তিগত অবস্থান এবং সুযোগ সুবিধা অর্জন করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্ব হচ্ছে এমন একটি সুযোগ যার মাধ্যমে জনগণ এবং সংগঠনের সেবা করা হয়। Robert K Greenleaf (১৯৭০ সালে The Servant as Leader নামক প্রবন্ধে) আধুনিক যুগের "সেবকের নেতা" এবং "সেবকের নেতৃত্ব" ধারণাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন নেতৃত্বের ধারণাটি হচ্ছে এমন একটি দর্শন যা সেবা পাওয়ার লক্ষ্যের পরিবর্তে অন্যকে সেবা করার লক্ষ্যে গঠিত হয় এবং এটি খুবই প্রাচীন একটি ধারণা যা বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতা এবং ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ আছে। নেতৃত্ব হচ্ছে জনগণ কেন্দ্রিক একটি ধারণা। যদিও নেতৃত্ব অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করে এবং কাজের ব্যাপারেও ব্যাখ্যা প্রদান করে।

জীবনের অনেক যোগ্যতাই দক্ষতা এবং জ্ঞান আহরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা উপযুক্ত পরিবেশের সাথে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু নেতৃত্ব একটু ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। ভালো নেতৃত্ব বলতে বুঝায় আবেগজনিত শক্তি এবং ব্যবহারজনিত বৈশিষ্ট্য যা একজন নেতৃত্বের মানসিক এবং আত্মিক শক্তিতে বিদ্যমান থাকে। নেতৃত্বের ভূমিকা হচ্ছে আধুনিক সমাজের জনগণের চাহিদা এবং সমস্যার একটি প্রতিফলন। তাই নেতৃত্ব হচ্ছে খুবই গভীর একটি ধারণা যা দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে অনেক জটিল বিষয়াবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে।

সাধারণত নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনাকে একইভাবে দেখা হয় যা প্রকৃতপক্ষে সঠিক নয়। নেতৃত্ব সম্বন্ধে আরও একটি ভুল ধারণা হলো এই যে নেতৃত্ব হচ্ছে এমন একটি সত্ত্বা যা জনগণকে আদেশ এবং নির্দেশনা দিয়ে থাকে

এবং কোনো সংস্থার পক্ষ থেকে নিজে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো প্রণয়ন করে থাকে। কিন্তু কার্যকরী নেতৃত্ব তার চেয়ে বেশি কিছু নির্দেশ করে।

নেতৃত্ব উন্নয়ন কর্মসূচির ধাপ

সামাজিক নেটওয়ার্ক ও নেতৃত্বের ভাবমূর্তি

সামাজিক নেটওর্য়াক কী

সামাজিক নেটওয়ার্ক এমন একটি সামাজিক কাঠামো যা ব্যক্তি ও সংগঠনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এবং নেটওয়ার্কের সদস্যদের মাঝে এক ধরনের অদৃশ্য বন্ধন কাজ করে। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক নেটওয়ার্ক তত্ত্বের সমালোচনা করেন এই অর্থে যে, এখানে প্রতিটি একক ইউনিটকে উপেক্ষা করা হয়, যদিও বাস্তবিক অর্থে তা সত্যি নয়। সমাজ বিশেষজ্ঞগণ সমাজের প্রতিটি ইউনিটের মাঝে বিরাজমান আন্তঃসম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে প্রায় শত বৎসর যাবৎ "সামাজিক নেটওয়ার্ক" ধারণাটিকে ব্যবহার করে আসছেন। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সামাজিক নেটওয়ার্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রকৃত অর্থে সামাজিক নেটওয়ার্ক এমন এক হাতিয়ার যা একজন মানুষকে নেতৃত্বের আসনে অভিষিক্ত করতে পারে, আবার এই হাতিয়ার ব্যবহার করে তিনি সফল নেতৃত্ব প্রদান করতে পারেন; আবার দূর্বল সামাজিক নেটওয়ার্কের কারণে এর ঠিক বিপরীত অবস্থা হতে পারে।

সাম্প্রতিককালে ইন্টারনেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ব্যবহার করে শুধুমাত্র নেতা নন, সাধারণ মানুষও সামাজিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছেন। বর্তমানে উন্নত দেশসমূহে ইন্টারনেটভিত্তিক ওয়েবসাইট অত্যন্ত শক্তিশালী ও কার্যকর সামাজিক নেটওয়ার্ক। আমাদের দেশে নেতৃবৃন্দ ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহারে অভ্যস্ত নন। বরং তাঁরা সনাতন চিন্তাপ্রসূত দলীয় কর্মসূচি সভা, সমা বেশ এবং গণযোগাযোগ এর দলীয় কর্মসূচি এবং দান্ন খয়রাত এর মধ্য দিয়ে সামাজিক নেটওয়ার্ক গঠন ও এর স্থায়ীত্বশীলতার বিষয়ে মনযোগী। তবে সাম্প্রতিককালে শিক্ষিত যুব শ্রেণী এমনকি পৌঢ় শ্রেণীর মানুষও ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে নেতৃত্ব বিষয়ক জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। পূর্বে সংবাদপত্র ও বিভিন্ন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক প্রত্রিকার "চিঠিপত্র কলাম" গণমাধ্যমভিত্তিক জনপ্রিয় সামাজিক নেটওয়ার্ক হিসাবে বিবেচিত হতো। ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয় ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক নেটওয়ার্ক।

সামাজিক নেটওয়ার্কিং

সামাজিক নেটওয়ার্কিং হচ্ছে এমন একটি চর্চা যেখানে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক নেটওয়ার্কের বিস্তার ঘটানো হয়। সামাজিক নেটওয়ার্কের উপস্থিতি সমাজের অস্তিত্বের সাথে বিদ্যমান কিন্তু বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই ধরনের নেটওয়ার্কের বিস্তার অনেক বেশী লক্ষ্য করা যায়। ওয়েবভিত্তিক সামাজিক নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে জনগণও নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী করতে সমর্থ হয়। ওয়েবভিত্তিক নেটওয়ার্কসমূহ অত্যন্ত কার্যকর এক সামাজিক বন্ধন, যেখানে সদস্যবৃন্দের জীবন বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তাঁদেরকে শুভেচ্ছা জানানো যায়, যে কোনো বিষয়ে ছবিসহ মতামত ব্যক্ত করা যায়, দীর্ঘমেয়াদী বিতর্কও পরিচালনা করা যায়। যে কোনো ব্যক্তি বা দল বা সম্প্রদায় অন্য যেকোনো ব্যক্তি বা দল বা সম্প্রদায়ের যে কারও মাধ্যমে একে অপরের সাথে সংযুক্ত হতে পারে।

ভাবমূর্তি (Image) কী

একজন ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তি বা নেতার নাম শুনে সেই ব্যক্তি বা নেতা সম্পর্কে যে ধারণার সৃষ্টি হয়, তাই ই মেজ বা ভাবমূর্তি। ভাবমূর্তি হলো নেতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন ব্যক্তিগত ঘটনা প্রবাহ, ইতিহাস, আচরণ ও ব্যবহার, শিষ্টতা, সততা এবং সমাজে তাঁর প্রতিফলন যা জনগণের মধ্যে একটি ধারণা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সমষ্টিগতভাবে কাজ করে।

নেতৃত্বের ভাবমূর্তি নেতা ও তার অনুসারী, যোগাযোগের মাধ্যমসমূহ এবং জনগণের সমষ্টিগত কাজের মাধ্যমে গঠিত হয়। ভাবমূর্তি গঠন প্রক্রিয়া নেতার প্রত্যাশা, নীতির ফলাফল, ঘটনা প্রবাহ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করে। নেতৃত্বের প্রতিকৃতি গঠনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় বেশী সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, যেমন এক্ক জনগণ প্রাথমিকভাবে একজন নেতার অতীত ভূমিকার উপর ভিত্তি করে তাকে মূল্যায়ন করে। দুষ্ট সংবাদ মাধ ্যমগুলো নেতার বর্তমান কার্যকলাপের মাধ্যমে তাকে মূল্যায়ন করে এবং তিন্ন অন ্যান্য অনুসারী নেতার রাজনৈতিক ভিত্তির মাধ্যমে মূল্যায়ন করে। একজন নেতার সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হচ্ছে তাঁর সম্পর্কে জনগণের ধারণা যা তাকে অন্যান্য অনুসারীর বিশ্বাস অর্জন, সংবাদ নিয়ন্ত্রণ বা ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করে এমনকি বিশেষ সংকটময় মুহূর্তেও। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তার অভিশংসনের বিতর্ককালীন সময়েও বেশীরভাগ জনগণের মাঝে তার পজেটিভ প্রতিকৃতি ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন কেননা জনগণের কাছে তার ব্যক্তিগত আচরনের প্রত্যাশা কম থাকলেও তার অর্থনৈতিক নেতৃত্বে সবাই সন্তুষ্ট ছিল। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল কারণ তার ব্যক্তিগত নৈতিক ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক নেতৃত্ব কোনোটাই জনগণকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

ভাবমূর্তি গঠন

নিজের সম্পর্কে নিজের ইতিবাচক ধারণাই একজন নেতাকে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। একজন নেতা তার নিজের ভাবমূর্তির মাধ্যমে নিজের কথা বলা ও কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন। এটি নিজের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আবেগময় বিবৃতি এবং নিজস্ব ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আত্মসমালোচনার মাধ্যমেও অনেক ভালো কাজ ও লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। একজন তাঁর নিজের মধ্যেই তার খারাপ দিকগুলো নিয়ে সমালোচনা করতে পারে।

একজন নেতা যখন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে তিনি তাঁর চিন্তা এবং আচরণের মধ্য থেকে খারাপ দিকগুলো বর্জন করবেন, তখন তিনি ভালো মানুষ হওয়ার যে স্বপ্ন তার উপরে তিনি গুরুত্বারোপ করবেন। যদি সেই লক্ষ্যপূরণ করতে তিনি ব্যর্থ হন, তখন তিনি নতুন করে চিন্তাভাবনার মাধ্যমে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়টি বের করে নিয়ে আসবেন।

ইতিবাচক ভাবমূর্তি গঠনের লক্ষ্যে একজন নেতাকে সর্বদাই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে হবে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি একজন নেতাকে কিভাবে সকলের কাছে গ্রহনযোগ্য করে তোলে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি

১. প্রতিটি ইতিবাচক কথা এবং প্রতিটি ইতিবাচক কাজই ইমেজ বা ভাবমূর্তি গঠনের এক একটি প্রক্রিয়া। ইতিবাচক ভাবমূর্তি গঠনের একটি প্রক্রিয়া হতে পারে ব্যক্তিগত দিনলিপি রাখা। একজন নেতা তাঁর ব্যক্তিগত দিনলিপিতে এমন অন্তত পাঁচটি ভালোকাজ লিপিবদ্ধ করবেন যা তাঁকে একজন ভালো নেতা হিসাবে তাঁর নিজ জগগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠিত করবে।

২. ইতিবাচক কথা এবং কাজ যা একবার ব্যবহার করা হয় সেটি আমাদের মস্তিষ্কের সাথে গেঁথে যায়। একজন নেতা যেখানেই যাননা কেন সেখানেই সেই ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করে থাকেন। নেতা তাঁর নিজস্ব ইতিবাচক দিকগুলো যত বেশী পছন্দ করবেন তত বেশী এগুলো প্রয়োগ করতে তিনি সমর্থ্য হবেন।

৩. "অন্য একজন ব্যক্তি যদি করতে পারে, তাহলে আমিও তা করতে পারবো" এটি কী আসলেই পুরোপুরি সঠিক? প্রকৃতপক্ষে কিছু কিছু দক্ষতা এবং প্রতিভা আছে যা কারো কারো থাকে আবার কারো কারো থাকে না। কিন্তু অনেক গুণ এবং দক্ষতাই আছে যা একজন নেতা সহজেই শিখতে এবং জানতে পারে। "প্রকৃত জ্ঞানী সেই যে সবার নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করে"। এই দৃষ্টিভঙ্গি একজন নেতার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৪. "আমি আমার নিজের মধ্যে সেই ছবিটিই আঁকব যা আমি হতে চাই"। একজন নেতা কথায় ও কাজে যা হতে চান মনে মনে সব সময় সেই ছবিটাই আঁকবেন। এর ফলে একজন নেতার মস্তিষ্কে নিজের ছবিটারই উন্নয়ন ঘটাতে পারবে।

৫. একজন ভাল নেতার এমন মানুষের কাছাকাছি থাকা উচিৎ নয় যে সবসময় আমাদের ক্ষতিকর ও দুর্বলতার কথা বলে। যদি ঐ ব্যক্তি বাহিরের কেউ হন তাহলে খুবই খারাপ কিন্তু যদি এটি নেতার ভিতরের একটি সত্ত্বা হন যা নেতার সম্ভাবনার বিরুদ্ধে কথা বলে তবে সেটি আরও বেশী ভয়ানক। নিজের সাথে নিজে কথা বলা আত্মপ্রতিকৃতি গঠনের দিক নির্দেশকের মত কাজ করে।

যোগাযোগ (Communication)

যোগাযোগ হচ্ছে এমন এক কার্যক্রম যার মাধ্যমে অর্থপূর্ণ তথ্য আদান প্রদান করা হয়। যোগাযোগের জন্য একজন প্রেরক, নির্দিষ্ট বার্তা এবং কাঙ্ক্ষিত প্রাপক প্রয়োজন। যোগাযোগের সময় প্রাপককে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকা কিংবা প্রেরকের যোগাযোগের উদ্দেশ্য বুঝতে পারা বাঞ্ছনীয় নয়; বরং সময় ও স্থান বিশেষে যেকোনো দূরত্বে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব। যোগাযোগের সময় অংশগ্রহণকারীকে উভয় পক্ষই একই মাধ্যমের যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হবে। যোগাযোগ প্রক্রিয়া তখনই সম্পূর্ণতা লাভ করে যখন উক্ত প্রক্রিয়ায় প্রাপক প্রেরকের বার্তার অর্থ বুঝতে পারেন।

নেতৃত্বের যোগাযোগ চক্র

যোগাযোগের ধরন

- মৌখিক যোগাযোগ;
- লিখিত যোগাযোগ;
- গণযোগাযোগ।

কার্যকরী যোগাযোগের বৈশিষ্ট্য

কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং তা নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রাখা নেতৃত্বের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কার্যকরী যোগাযোগের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ হতে পারে:

- **উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা:** যে বার্তাটি পাঠানো হবে সে সম্পর্কে প্রেরকের অবশ্যই স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে, যাকে বার্তাটি পাঠানো হবে এবং পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবশ্যই প্রেরকের স্পষ্ট ধারণা থাকবে।
- **সম্পূর্ণতা:** পাঠানো বার্তাটি সম্পূর্ণ হতে হবে। বার্তাটি যেন পরিকল্পিত এবং সুগঠিত হয়। বার্তাটি বুঝতে যেন প্রাপকের কোনো নতুন ধারণার আশ্রয় নিতে না হয়।
- **সংক্ষিপ্ততা:** বার্তাটি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হতে হবে। কোনো অপ্রয়োজনীয় বিস্তারিত বিষয় থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বার্তাটি ছোট কিন্তু সম্পূর্ণ হওয়া উচিৎ।

- **প্রত্যুত্তর:** প্রেরক যখন কোনো বার্তা পাঠান তখন প্রাপক তার প্রত্যুত্তর দিবেন, যাতে করে প্রেরক সহজেই বুঝতে পারে যে বার্তাটি যথাস্থানে পৌঁছেছে। প্রত্যুত্তরটি সময়মত ও ব্যক্তিগত হওয়া দরকার। এটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হওয়া উচিৎ।
- **অন্যের অনুভূতি বুঝতে পারা:** মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে শ্রবণকারীকে বক্তার অনুভূতি বুঝতে পারা খুবই প্রয়োজন। বক্তা অবশ্যই তার বলার সময় শ্রবণকারীর আচরণের দিকে লক্ষ্য রাখবেন, যার মাধ্যমে তিনি শ্রোতাবৃন্দের চাহিদা সম্পর্কে বুঝতে পারবেন। এই প্রক্রিয়ায় একে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝার চেষ্টা করবেন এবং কার্যকরী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে।
- **প্রাপকের চাহিদা অনুসারে বার্তা তৈরি:** একটি সংগঠনে বিভিন্ন ধরনের মানুষের চাহিদা অনুসারে ভিন্ন রকমের বার্তা হওয়া উচিত। স্পর্শকাতর শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ এর দরুণ ভুল বুঝাবুঝি কিংবা ভুল ব্যাখ্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই বার্তাটি উদীষ্ট প্রাপকের চাহিদা অনুসারে তৈরি করতে হবে।
- **যোগাযোগের বহুমুখী ব্যবস্থা:** কার্যকরী যোগাযোগের জন্য বহুমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ যার ফলে একটি বার্তার স্পষ্টতা বৃদ্ধি পায়। যখন একটি বার্তা প্রেরণে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তখন বার্তাটিকে খুব বেশি পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়না।

যোগাযোগ মডেল

যোগাযোগ এর সফলতার কিছু কৌশল

১. **মনোযোগ আকর্ষণ নিশ্চিতকরণ:** প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য যে বিবৃতি বা উদ্ধৃতি তৈরি করা হয় তা সব সময় একটি নির্ধারক/নাম দিয়ে শুরু হওয়া উচিৎ। এটা কোনো ব্যক্তির নাম হতে হবে এমন নয়, বরং উভয়ের মাঝে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি অভিবাদন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ- কোনো বাক্য "Hello" শব্দটি দিয়ে শুরু হতে পারে অতঃপর একটু থেমে থাকা এবং পুনরায় শুরু করার আগে শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা। একজন নেতার জন্য এটা খুবই কঠিন কাজ, বিশেষ করে যখন জনগণ নিজেদের মধ্যে কথা বলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

২. **চোখের দিকে তাকিয়ে এবং সুস্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলা:** নিজের প্রতি কারো মনোযোগ আকর্ষণ করতে হলে অবশ্যই তার মনোযোগ অর্জন করতে হবে। যেকোনো আলোচনা তা যতই সংক্ষিপ্ত হোক না কেন অপরের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা দরকার। নিশ্চিত নিশ্চিত হতে হবে যেন অপর পক্ষের সঙ্গে আই কনটাক্ট (Eye contact) নিশ্চিত হচ্ছে এবং আলোচনার সময় আলোচ্যসূচীর বাইরে অন্য কোন বিষয় যেন আলোচনায় চলে না আসে। প্রতিটি শব্দ সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা দরকার যেন প্রতিটি শব্দ একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত থাকে।

৩. **সহজ এবং সোজাসুজি বিবৃতি ব্যবহার করা:** যোগাযোগের সময় বিবৃতিটি সংক্ষিপ্ত এবং বর্ণনামূলক হওয়া উচিত। "মা আমি খুব খুশি হব যদি তুমি তাড়াতাড়ী নাস্তা খাওয়া শেষ কর এবং তৈরি হও কারণ আমাদের দেরি হয়ে গেছে" এইরূপ বলার পরিবর্তে বলা যেতে পারে যে "মা দয়া করে নাস্তা করা শেষ করো যেন আমরা সঠিক সময়ে বের হতে পারি"। এটি যোগাযোগের খুবই সহজ একটি রাস্তা।

৪. **নির্দেশ দেয়া থেকে বিরত থাকা এবং জিজ্ঞেস করা:** বেশির ভাগ প্রাপ্তবয়স্করাই চায় কোনো কিছু করার ক্ষেত্রে তাদেরকে নির্দেশ না দিয়ে বরং জিজ্ঞেস করা হোক, এক্ষেত্রে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে "Can" "Will" "Please" যেমন- "তুমি কি এই চেয়ারটিতে বসবে"?

৫. **কাছাকাছি যাওয়া:** যদি বিশেষ কারও সাথে কথা বলার সময় সে যদি কথা শুনতে না পায় তাহলে জোরে কথা বলার পরিবর্তে তার নিকটে যাওয়া এবং তার সাথে কথা বলা ভালো। একজন মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়াবলীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া দরকার। তবে মনে রাখতে হবে যে সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে নিজেকে বুঝতে পারা।

৬. **কাউকে বাদ না দেওয়া বা এড়িয়ে না যাওয়া:** বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আলোচনার সময় মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষদেরকে এক পাশে ফেলে রাখা হয়। একজন সেবা প্রদানকারী হিসেবে সব ধরনের মানুষকেই আলোচনাতে গুরুত্ব দিতে হবে। বরং এদের সাথে নিজেই কথা বলে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে যেন অন্যেরাও তা করতে উৎসাহিত হয়।

৭. **শ্রবণ করা:** শ্রবণ করা খুবই সহজ একটি বিষয় কিন্তু এটিকেও অবহেলা করা যাবেনা। পছন্দের ব্যক্তিটি অন্য যে কারো থেকে অনেক ভালো এবং এই ধারণাটিকে সুবিধা হিসেবে ব্যবহার করা। একজন সেবা প্রদানকারী হিসেবে বেশিরভাগ সময়ই প্রধান কাজ হচ্ছে শ্রবণ করা এবং যখন কেউ কোনো কথা নাও বলে তখনও তা শ্রবণ করা যায়; কারও হাত ধরার মাধ্যমেও তার সাথে যোগাযোগ করা যায়।

নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যোগাযোগের সময় যা করা যাবে এবং যা করা যাবে না

একজন ভালো নেতার জন্য ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে যোগাযোগের জন্য নিম্নোক্ত কিছু নির্দেশনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ:

- কার্যকরভাবে যোগাযোগের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সময় ব্যয় করা।
- অন্যের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। অন্যের অনুভূতির বিষয়ে সচেতন থাকা এবং তা বুঝার চেষ্টা করা।
- অন্যের সাথে কাজ করার সময় কাজে জড়িত থাকার মানসিকতা উন্নত করা। সব সময় উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং ভালো মানসিকতার সাথে কাজ করা।
- সেই সকল মানুষের সাথে কাজ করা, যাদের সংস্কৃতি, গোত্র, নৃতত্ত্ব এবং অন্যান্য বৈশিষ্টাবলী পৃথক বা অন্য ধরনের। ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের সাথে ও উপযুক্ত সময় ব্যয় করা।

- প্রতিবন্ধী মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা। অক্ষম মানুষ বলার চেয়ে প্রতিবন্ধী হিসেবে তাদেরকে দেখা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার অসহায়ত্বের বাইরে এনে মূল্যায়ণ করা।
- নিজেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা প্রদানকারী হিসেবে অন্যের নিকট উদাহরণ সৃষ্টি করা।
- সঠিকভাবে নাম উচ্চারণ করতে শিখা। প্রয়োজনে পরিশ্রম করে অন্যের নাম মনে রাখা।
- একজন ভালো শ্রোতা হওয়া।
- জনগণকে তাদের অভিজ্ঞতা যেমন সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য এবং সচেতনতা প্রভৃতি সম্বন্ধে বলতে উৎসাহিত করা
- বিভিন্ন ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলীগুলো বুঝতে শেখা ও তা সম্মান করা। যখন কেউ কিছু বিশ্বাস করে- তা কেন বিশ্বাস করে এবং তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কী রয়েছে ইত্যাদি বুঝতে শেখা।
- অন্যের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জানা (যেমন- সমাজের সম্মানিত বা বয়স্ক কারও সাথে সঠিকভাবে আচরণ করা, শিক্ষা ব্যবস্থার ভিন্নতা, অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী ইত্যাদি)।
- অন্যের দৈহিক অঙ্গভঙ্গি/দৈহিক ভাষা বুঝতে শেখা। কার্যকরী যোগযোগের অব্যক্ত আচরণ, শব্দের ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমেও সম্পাদিত হয়ে থাকে।
- ভিন্ন ধরনের বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ইতিবাচক ভাষা ব্যবহার করা। ব্যক্তিগত আক্রমণ না করা। মতবিরোধের প্রতি সমর্থন জানানোও একটি ভালো উপায়। ভিন্নতার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।
- অন্যের ব্যবহৃত ভাষার মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো।
- বৈষম্যমূলক আচরণ কিংবা কাজের বহিঃপ্রকাশ না ঘটানো কেননা অন্যরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। নিজেকে একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা।

পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কী

Change Management বা "পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা" একটি পদ্ধতিগত পরিবর্তন যার মাধ্যমে কোনো সংস্থার বর্তমান অবস্থাকে ভবিষ্যতের কোনো প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার তিনটি প্রেক্ষিত রয়েছে যথা, সংস্থার আইনগত ও নৈতিক পরিবর্তনের লক্ষ্য নির্ধারণ, কাঠামোগত পরিবর্তনের রূপরেখা প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন, সংস্থার জনবল ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন। কোনো সংস্থায় উপরোক্ত পরিবর্তনসমূহ আনতে হলে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের যে বিষয়াদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে, পরিবর্তিত ব্যবস্থাপনার যথাযথ রূপরেখা ও কাঠামো স্থাপন, পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং পরিবর্তনকে কার্যকর করা। পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় নেতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা "পরিবর্তন প্রয়োজন"-এই উপলব্ধি নেতার মধ্যে আসতে হবে, তাঁকে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতে হবে, পরিবর্তনের রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন ও কার্যকর করতে হবে।

পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার সময় সংস্থার নেতৃত্বকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই কার্যক্রম কোনো সরল রৈখিক নিষ্কন্টক পথ নয়। পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন ও কার্যকর করতে যেয়ে নেতৃত্বকে যে বিষয়গুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা উচিৎ তা হচ্ছে:

১. সংস্থার আইনগত কর্তৃপক্ষ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবাহিনী পরিবর্তনকে একই অর্থে গ্রহণ নাও করতে পারেন
২. উপরোলিখিত তিন পক্ষ বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া (দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব ও আচরণ) ব্যক্ত করতে পারেন, তা মিশ্র কিংবা নেতিবাচকও হতে পারে
৩. কর্মীবাহিনীর মধ্যে এক ধরনের ভীতি কাজ করে, বিশেষত চাকুরীচ্যুতি কিংবা নতুন ব্যবস্থাপনায় যথাযথ পদ না পাবার ব্যাপারে
৪. পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কার্যকরী হওয়ার পরে নতুন ব্যবস্থাপনা কিংবা পদে সন্তুষ্ট না হয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মী চলে যেতে পারেন

সংগঠনগত পরিবর্তনের ক্ষেত্র

পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা সাধারণত সাংগঠনিক অর্থেই ব্যবহার করা হয়। সাংগঠনিক পরিবর্তনের নানা দিক রয়েছে, কখনো কখনো কোনো সংস্থায় একই সাথে সকল দিকেই পরিবর্তন, আবার কখনো এক বা একাধিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনায়নের কার্যক্রম শুরু হয়। সাংগঠনিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১. আইনগত অবস্থান পরিবর্তন
২. নৈতিক অবস্থান পরিবর্তন
৩. নীতিগত পরিবর্তন (লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কৌশল)
৪. কর্মসূচি পরিবর্তন
৫. কাঠামোগত পরিবর্তন
৬. দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণের (কর্মীদের) পরিবর্তন
৭. প্রযুক্তিগত পরিবর্তন।

অনেক সময়ই দেখা যায় যে, অনেক বে-সরকারী সংস্থাতে পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা বলতে কাঠামোগত পরিবর্তনকে প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হওয়া উচিৎ সংগঠনের নৈতিক ও নীতিগত অবস্থানের জায়গা থেকে এবং এটি করতে যেয়ে আইনগত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিতে পারে। আবার কাঠামোগত পরিবর্তন কর্মসূচী পরিবর্তনের সাথেও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পরিবর্তনের সার্বিক সফলতা আনতে হলে কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণেও পরিবর্তন প্রয়োজন; এমনকি প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সকল ক্ষেত্রকেই স্পর্শ করে এবং তা অত্যন্ত ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিকারী ঘটনা।

পরিবর্তন কেন

চলমান ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন করে নতুন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবেন সংস্থার নেতৃত্ব। কিন্তু এই উপলব্ধি কোন প্রেক্ষাপটে নেতৃত্বের মধ্যে জাগ্রত হবে? পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সকল ক্ষেত্রকেই স্পর্শ করে এবং তা অত্যন্ত ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিকারী ঘটনা।

সুতরাং পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা। আবার এর প্রেক্ষাপটও হওয়া উচিৎ ব্যাপক। সংগঠনের নেতৃত্ব বিভিন্ন কারণে এবং পরিবর্তিত ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারেন, তা হতে পারে:

১. আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থাসমূহের আন্তর্জাতিক নৈতিক ও নীতিগত অবস্থান অথবা কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক কাঠামো অথবা কর্মসূচী পরিবর্তনের কারণে জাতীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে।

২. সংস্থার নৈতিক বা নীতিগত অবস্থান পরিবর্তনের প্রয়োজনেও পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এই উপলব্ধি বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের মিথস্ক্রীয়ার ফলে উদ্ভব হতে পারে। আইনগত কর্তৃপক্ষ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবাহিনী এমনকি উপকারী জনগণের মধ্য থেকেও এই চাহিদার দেখা দিতে পারে।

৩. সংস্থার কর্মসূচীগত পরিবর্তনের প্রয়োজনেও পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। আইনগত কর্তৃপক্ষ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবাহিনী এমনকি উপকারী জনগণের মধ্য থেকেও স্বতন্ত্রভাবে কিংবা সম্মিলিতভাবে এই চাহিদার দেখা দিতে পারে।

৪. আর্ন্তজাতিক সমন্বয়, নৈতিক বা নীতিগত অবস্থান পরিবর্তন কিংবা কর্মসূচীগত পরিবর্তনের প্রয়োজনে সংস্থার কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

৫. সংস্থার নৈতিক বা নীতিগত অবস্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণের পরিবতর্নের প্রয়োজনেও সংগঠনের নেতৃত্ব বিভিন্ন কারণে এবং পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারেন।

তিনিই যোগ্য ও দূরদর্শী নেতা যিনি সঠিক সময়ে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, যথাসময়ে পরিবর্তন শুরু করেন এবং নির্ধারিত সময়ে শেষ করেন।

পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার ১০ টি মূলনীতি

পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার উপলব্ধি, এর রূপরেখা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন

মধ্যমমেয়াদী এক সুচিন্তিত, দক্ষ ও কৌশলী নেতৃত্বের আর্ট বা শিল্পকর্ম। পরিবর্তনের লক্ষ্য সাংগঠনিক কিন্ত এর নায়ক ও কুশীলব সকলেই মানুষ এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় তাঁরা যে শুধুমাত্র কুশীলব তাই নয় বরং এর সাথে তাঁদের স্বার্থও জড়িত রয়েছে। সুতরাং সংগঠনের নেতৃত্বকে অবশ্যই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় কিছু নীতিমালা মেনে চলা উচিৎ, যা নিম্নরূপ হতে পারেঃ

১. পরিবর্তন প্রক্রিয়া সংগঠনের নৈতিক অবস্থান সনাক্তকরণের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যাওয়া উচিৎ। শুধুমাত্র কাঠামোগত পরিবর্তন যদি হয় পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য তাহলে তা বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

২. পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব ও পরিবর্তন দলকে পরিবর্তনের প্রতি সৎ ও আন্তরিক হতে হবে। পরিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পাদনের লক্ষ্যে নেতৃত্ব ও পরিবর্তন দলকে সংগঠনের নৈতিক ও নীতিগত পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই বিশেষ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হওয়া যাবে না।

৩. পরিবর্তন প্রক্রিয়া পরিচালিত হওয়া উচিৎ অংশগ্রহণমূলক নীতির উপর ভিত্তি করে। সংস্থার আইনগত কর্তৃপক্ষ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবাহিনীকে শুরু থেকেই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া উচিৎ, যেন কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবাহিনী সকলেই এই প্রক্রিয়ায় কুশীলব হতে পারেন।

৪. পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হতে হবে সংগঠনের উপর থেকে এবং তা সংগঠনের নৈতিক ও নীতিগত পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিৎ।

৫. কাঠামোগত পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় বাইরে থেকে কর্মী নিয়োগের পূর্বে অভ্যন্তরীন সকল কর্মীকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নতুন সৃষ্ট পদে যাওয়ার সুযোগ দেয়া উচিৎ।

৬. পরিবর্তন প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই সকল স্তরের কর্মীকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে সকল কর্মীকেই হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা উচিৎ। কর্মীদের মনোভাবও কর্তৃপক্ষের জেনে নেয়া উচিৎ। কেননা, কর্মীবাহিনী যদি হতোদ্যম হয়ে পড়ে তাহলে পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে।

৭. পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় "মানবীয় দিকগুলো" নির্ণয় করা প্রয়োজন এবং সংস্থার নিবেদিতপ্রাণ ও দক্ষ কর্মীদের পুরস্কৃত করার উদ্যোগ নেয়া উচিৎ।

৮. দ্রুত এবং অল্প সময়ে পরিবর্তন প্রক্রিয়া শেষ করা উচিৎ নয়। কর্মীবাহীনিকে পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অংশে পরিণত করতে হলে তাদেরকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয়ার সময় দিতে হবে। সেক্ষেত্রে তারা তাদেরকে মানিয়ে নেয়ার কৌশল রপ্ত করবে, মতামত প্রদান করবে, পরিবর্তিত প্রক্রিয়ায় অংশ নিবে এবং নিজেদেরকে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে।

৯. পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাঁরা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করছেন বা টিকে থাকাকে নিরন্তর কষ্টকর মনে করছেন, নেতৃত্ব ও পরিবর্তন দল তাঁদের জন্য পরামর্শ ও কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করতে পারেন। তাঁদের অনেকেই হয়তো সংস্থার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। সুতরাং নেতৃত্ব ও পরিবর্তন দল কর্তৃক কাউন্সেলিং তাঁদেরকে সংস্থা ছেড়ে চলে যেতে নিরুৎসাহিত করবে।

১০. নতুন ব্যবস্থাপনার সুফল যেন কর্মীবাহিনী অনুভব করে, তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন যেন সহজ হয়। অন্যথায় পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা তাদের কাছে নেতিবাচক বার্তাই পৌঁছে দিবে।

পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া

একটি নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনায় পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া হলো কতগুলো ধাপের একটি ধারাবাহিকতা, যা একটি ব্যবস্থাপনা দল কর্তৃক অনুসরণ করা হয়ে থাকে। সবচেয়ে কার্যকরী পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়ায় তিনটি ধাপ অনুসরণই করে থাকে।

ধাপ্ল ১ : পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি প্রস্তুতি: নিরূপন এবং কৌশলগত উন্নয়ন

ধাপ্ল ২ : পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার প্রণয়ন রূপরেখা

ধাপ্ল ৩ : পরিবর্তন শক্তিশালীকরণ: তথ্য সংগ্রহ, সংশোধনমূলক কাজ ও স্বীকৃতি

উপরোক্ত ধাপগুলোর ফলাফল নিম্নোক্ত চিত্রে দেখানো হলো-

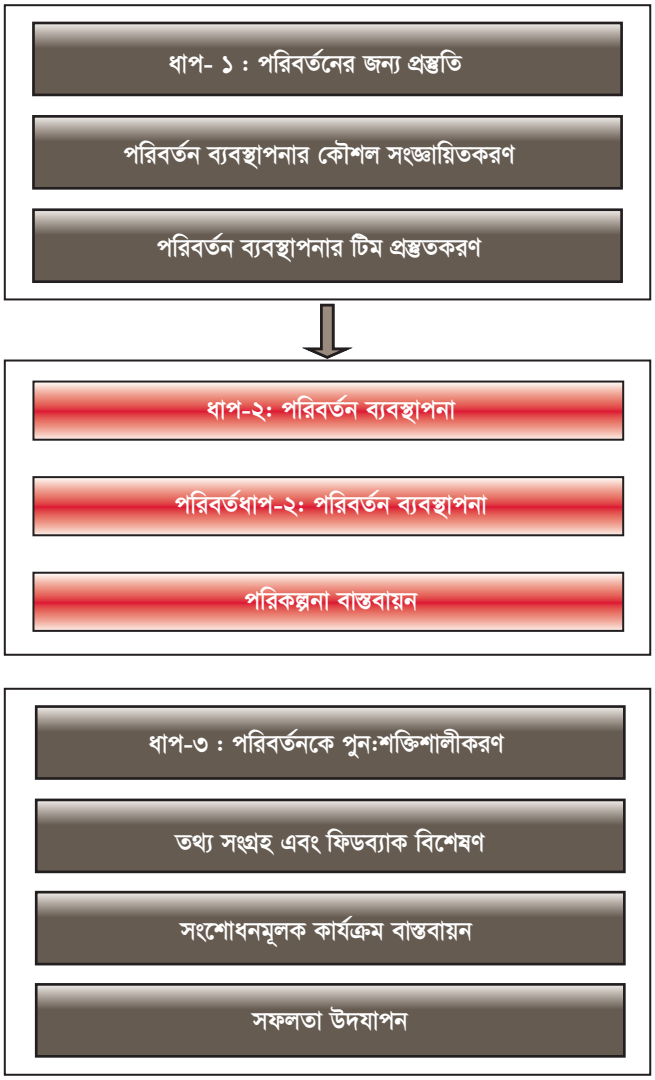

চিত্র: পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া (উপরের চিত্রটি পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার কার্য্র প্রক্রিয়াকে উপস্থাপন করে)

উপরের ডায়াগ্রাম বা চিত্রটি বিশ্লেষণ করলে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে:

ধাপ ১: পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি	পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞায়িতকরণ (ধারণাপত্র তৈরী)	১. পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট চিহ্নিত
		২. প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ
		৩. পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রত্যাশিত সুফল চিহ্নিত
		৪. পরিবর্তনের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত
		৫. কত সময় ধরে চলবে এবং কখন শেষ হবে?
	পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার টিম গঠন	১. টারমস্ অব রেফারেন্স তৈরী (পরামর্শকের সহায়তা নেয়া যেতে পারে) ও সংস্থার নীতি নির্ধারণী পরিষদে এর অনুমোদন
		২. টারমস্ অব রেফারেন্স অনুযায়ী পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টিম গঠন
		৩. পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা টিম এর পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রতিষ্ঠা
	পরিবর্তনের প্রস্তাবিত রূপরেখা বা মডেল উন্নয়ন	১. আইনগত অবস্থান পরিবর্তন, নৈতিক অবস্থান পরিবর্তন, নীতিগত পরিবর্তন (লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কৌশল), কর্মসূচী পরিবর্তন, কাঠামোগত পরিবর্তন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণের (কর্মীদের) পরিবর্তন ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন্ন উপরোল্লিখিত কোন কোন ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন হবে তার রূপরেখা (মডেল) প্রণয়ন
		২. সংস্থার সকল স্তরের কর্মীদের প্রস্তাবিত মডেল নিয়ে আলোচনা এবং ফিডব্যাক গ্রহণ
		৩. সংস্থার নীতি নির্ধারণী পরিষদে অনুমোদনের লক্ষ্যে চূড়ান্ত পরিবর্তনের রূপরেখা বা মডেল উপস্থাপন
ধাপ ২: পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা	পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ	১. পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের রূপরেখা ঘোষণা
		২. সময়সীমা নির্ধারণ
		৩. কর্মী পর্যায়ে অবহিতকরণ

	পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১. আইনগত অবস্থান পরিবর্তন, নৈতিক অবস্থান পরিবর্তন, নীতিগত পরিবর্তন (লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কৌশল), কর্মসূচী পরিবর্তন, কাঠামোগত পরিবর্তন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণের (কর্মীদের) পরিবর্তন ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন্ন উপরোল্লিখিত যে সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হবে তা বাস্তবায়নের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন
		২. কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবর্তন বাস্তবায়ন
		৩. পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা
		৪. পরিবর্তনের অগ্রগতি কর্মী পর্যায়ে অবহিতকরণ
পরিবর্তনকে পুন:শক্তিশালী করণ	তথ্য সংগ্রহ ও ফিডব্যাক বিশ্লেষণ	১. পরিবর্তনের প্রাথমিক কার্যাদি সমাপ্তির পর সংস্থার আইনগত কর্তৃপক্ষ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবাহিনী থেকে নতুন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ফিডব্যাক গ্রহণ
		২. ফিডব্যাক বিশ্লেষণ
	সংশোধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন	১. ফিডব্যাক বিশ্লেষণের আলোকে সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ ও তা দূরীকরণে নতুন কৌশল প্রণয়ন
		২. সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ ও তা দূরীকরণে নতুন কার্যক্রম গ্রহণ
	সফলতা উদযাপন	১. সংস্থার আইনগত কর্তৃপক্ষ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবাহিনীর কাছে পরিবর্তনের সমাপ্তি ঘোষণা

নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সিদ্ধান্ত বলতে বোঝায় একাধিক বিকল্পের মধ্য থেকে একটি পছন্দ। (A choice made between alternative courses of action in a situation of uncertainty)। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সঠিক ও সময়পোযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপরিহার্য। কর্মক্ষেত্রে কখনো কখনো এমন কিছু সমস্যার উদ্ভব হয় যখন চারপাশের সকলের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখেই সমাধান গ্রহণ করা উচিৎ। এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সকলেরই অত্যন্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সংগঠন বা দলগত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবেই অগ্রসর হওয়া উচিৎ, যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হয়। গণতান্ত্রিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত সকলের সিদ্ধান্ত বলে গণ্য করা যায় না। বিশেষত সংগঠনে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করলে সংগঠন লক্ষ্য অর্জনে ব্যার্থ হতে পারে, যেকারণে সংগঠনে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের পরিবর্তে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সর্বাধিকসংখ্যক মতামতের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপরে জোর দেয়া হয়।

কোনো একটি দল বা সংগঠনে এর সদস্যবৃন্দ তিন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে; যথা:

১. সদস্যবৃন্দ নেতৃত্বের সরাসরি নির্দেশনা ছাড়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সকল সংগঠনেই কিছু কার্যক্রম রয়েছে, যা রুটিন বা দৈনন্দিন কার্যক্রম। এগুলো সংগঠনের সদস্যবৃন্দ স্থায়ী নির্দেশনা ও অভ্যাস (প্র্যাকটিস) মোতাবেক নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে। নেতা যদি কোনো সদস্য নেতৃত্বকে অবহিত করতে চান বা তাঁর কাছ থেকে সিদ্ধান্ত প্রত্যাশা করেন, তাহলে নেতার ভূমিকা হবে–তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজ

উদ্যোগেই সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্যোগী হওয়ার জন্য তাঁকে বলা।

২. সদস্যবৃন্দ নেতৃত্বের সরাসরি নির্দেশনা ছাড়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে? কিন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তা নেতৃত্বকে অবহিত করতে হয়। সংগঠনেই কিছু কার্যক্রম রয়েছে, যা সদস্যবৃন্দ স্থায়ী নির্দেশনা ও অভ্যাস মোতাবেক নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে, কিন্ত বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব কর্তৃক পুনঃযাচাই বা আনুষ্ঠানিক সম্মতির প্রয়োজন হয়ে থাকে। নেতার ভূমিকা এক্ষেত্রে যদি কোনো সদস্য নেতৃত্বকে অবহিত করতে চান বা তাঁর কাছ থেকে সিদ্ধান্ত প্রত্যাশা করেন, তাহলে নেতার ভুমিকা হবে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদেরকে সহায়তা করা এবং দলগতভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

৩. নেতৃত্বের নির্দেশনা ছাড়া সদস্যবৃন্দ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। আরো কিছু বিষয় রয়েছে, যে সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্যোগ নিয়ে থাকেন, তিনি সদস্যবৃন্দকে অবহিত করেন, তাঁদের মতামত গ্রহণ করেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। এক্ষেত্রে যদি এর ব্যত্যয় হয়ে থাকে অর্থাৎ টিম বা এর কোনো সদস্য যদি নেতৃত্বকে অবহিত না করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন বা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, সেক্ষেত্রে নেতৃত্বের উচিৎ টিম বা টিমের কোন সদস্যকে এর কুফল বা ঝুঁকি সম্পর্কে জানানো।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতার মূল ভূমিকা সহায়কের। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহায়তাকারী। সংগঠন বা এর সদস্যবৃন্দের উদ্যোগকে স্বাগত জানানো, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন। তিনি সর্বদাই সংগঠনের দর্শন, মূল্যবোধ, নীতিমালার মধ্যে থেকে দল বা এর সদস্যবৃন্দের উদ্যোগকে উৎসাহিত করবেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদক্ষেপসমূহ

কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অনেকগুলো সম্ভাব্য বিকল্প থেকে একটি নির্দিষ্ট বিকল্প গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়-এটি নেতা বা ব্যবস্থাপকের দক্ষতাও বটে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা ও সময় ব্যবস্থাপনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনিই যোগ্য নেতা অথবা ব্যবস্থাপক যিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৌশলগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জানা এবং তার চর্চা করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণের কৌশলগুলো নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হলো:

১. সমস্যা সংজ্ঞায়িতকরণ

একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হচ্ছে সমস্যা সংজ্ঞায়িত করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হচ্ছে যে সমস্যাটি সমাধান করা হবে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা। সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তার লক্ষ্য ও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নিয়ে চিন্তা ও আলোচনা করতে হবে, যা সিদ্ধান্ত প্রণেতাদেরকে সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ খুঁজে পেতে সহায়তা করবে।

২. বিকল্প পন্থার উন্নয়ন

সমস্যা সংজ্ঞায়িতকরণের পরের ধাপ হচ্ছে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের বিকল্পগুলো নিয়ে আলোচনা করা। অলোচনাকে কোনো নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিৎ হবে না, বরং উদ্ভাবনী দক্ষতা ব্যবহার করে সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ নিয়ে আলোচনা করতে হবে। প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। আলোচনায় এমন কিছু বিকল্প চলে আসতে পারে আপাতদৃষ্টিতে যার কোনো কোনোটিকে অপ্রয়োজনীয় বা অসংগত মনে হতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থাতেই কোনো বিকল্পকে বাতিল করে দেয়া উচিৎ নয়, কেননা কখনো কখনো সমস্যার সমাধান সেই নির্দিষ্ট গন্ডির বাইরে থেকেও আসতে পারে। সমস্যাটির সমাধানকল্পে সঠিক পন্থা উদ্ভাবনে কখনো কখনো অনেক গবেষণাও করতে হতে পারে।

৩. বিকল্প পন্থার মূল্যায়ন

এই ধাপটিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বলা যেতে পারে। এখানে বিকল্প প্রস্তাবগুলো ব্যাখ্যা করতে হবে। প্রতিটি বিকল্পের সুবিধা এবং অসুবিধা এবং সম্ভাবনা খুঁজে বের করতে হবে। এই পর্যায়ে যে সকল বিকল্প উদ্দেশ্য পূরণ করবে না তা বাছাই করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বাইরে রাখতে হবে।

৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণ

এই ধাপটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। পূর্ববর্তী ধাপে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সম্ভাবনাময় বিকল্পসমূহের মধ্য থেকে যেটিকে সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে হয় সেটা নির্বাচন করতে হবে। ভালো সমাধানের লক্ষ্যে একটির পরিবর্তে একাধিক বিকল্পের সংমিশ্রণও গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরের ধাপ হলো গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন। গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ারই একটি অংশ। গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে কিনা তা যাচাই ও পরিবীক্ষণ গৃহীত সিদ্ধান্তের যথার্থতা নিরূপণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৬. শিখন

গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে "শিখন" সমূহ কী কী তা সনাক্ত করতে হবে। বাস্তবায়ন পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে কতটুকু সহায়ক হচ্ছে তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। প্রয়োজনে গৃহীত সিদ্ধান্ত সংশোধন ও পুনঃবাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এই ছয়টি ধাপকে অনেক জটিল মনে হতে পারে। যাই হোক এগুলো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কৌশল যা আমাদের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতৃত্বের ভূমিকা

কোনো একটি সংগঠন বা টিমে নেতৃত্ব শুধুমাত্র কোনো একটি পদ নয়, বরং এক চলমান দায়িত্ব। শুধুমাত্র নেতৃত্বই নন, সংগঠন বা টিমের প্রতিটি সদস্যেরই একটি পদ রয়েছে এবং ঐ পদাধিকারীর দায়িত্ব নিজ অবস্থান থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নেতৃত্বকে সহায়তা করে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা। টিমের সকল সদস্যেরই নিজ নিজ দায়িত্বের আলোকে তাঁর যে ভূমিকা সেটাই তাঁর জন্য নেতৃত্ব। নিচের ছকে দায়িত্বসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কোন পরিস্থিতিতে সকল সদস্যের নেতৃত্ব বিষয়ক ভূমিকা কী হবে তা চিহ্নিত করার সুযোগ তৈরী করা হয়েছে:

নেতৃত্বের ভূমিকা	কখন বা কোন পরিস্থিতিতে তিনি এই ভূমিকা নিবেন?
লক্ষ্য অর্জন চাহিদা ও করণীয় নির্ধারণ এবং লক্ষ্য অর্জনে দলকে উজ্জিবিতকরণ	
করণীয় চিহ্নিতকরণ বিদ্যমান সম্পদ কাজে লাগিয়ে লক্ষ্য অর্জনে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	
দায়িত্ব নির্ধারণ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে দলে দক্ষ ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ এবং দায়িত্ব অর্পণ	
পরিবীক্ষণ চলমান কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মাইলস্টোনসমূহ চিহ্নিতকরণ ও পর্যবেক্ষণ	
কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ, সাফল্য ও সম্ভাবনাসমূহ নিয়মিত দলকে যথাসময়ে অবহিতকরণ এবং দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ স্থাপন	
সমস্যা সমাধানে সহায়তা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতৃত্ব প্রদান	
প্রতিবেদন প্রণয়ন কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ, সাফল্য ও সম্ভাবনাসমূহ নথিকরণ এবং লক্ষ্য অর্জনের মাইলস্টোনসমূহ চিহ্নিতকরণ	
আন্তঃব্যক্তিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা নিরসনে অবদান এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, আন্তঃব্যক্তিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তা নিরসনে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে	
সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করে লক্ষ্য অর্জনে সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ	
সফলতা উদযাপন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শেষে সফলতা উদযাপন ও টিমের সদস্যবৃন্দের অবদান এর স্বীকৃতি	

জয় জয় সমঝোতা

উইন উইন নেগোসিয়েশন বা জয় জয় সমঝোতা কী?

যে কোনো ইস্যুতেই ব্যক্তি এবং সংগঠন নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে সাধারণত নিজ নিজ অর্জনের দিকটিই দেখতে চায়। কিন্তু এর দরুণ অন্য ব্যক্তি বা সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর দরুন ব্যক্তিগত ও সাংগঠিনিক দ্বন্দ্ব তৈরী হওয়া স্বাভাবিক, যা সকল পক্ষের জন্যই ক্ষতিকর। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে এমন এক অবস্থা প্রয়োজন যা কোনো একটি ইস্যুতে সংশি-ষ্টসকল পক্ষের জন্যই সুবিধাজনক। ইংরেজি শব্দ *Negotiation* ও *Compromise* কখনো কখনো আমাদের মধ্যে অর্থগত বিভ্রান্তি তৈরী করে; প্রকৃতপক্ষে শব্দ দু'টি বাংলা ভাষায় ভিন্ন ব্যঞ্জনা তৈরী করে। প্রকৃতপক্ষে নেগোসিয়েসন "কমপ্রোমাইজ বা আপোষ" লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়।

তত্ত্বগতভাবে উইন উইন নেগোসিয়েশন বা জয় জয় সমঝোতা প্রক্রিয়ায় সংশি-ষ্টসকল পক্ষ এমন এক মতৈক্য বা চুক্তিতে পৌঁছায় যার দ্বারা সকল পক্ষই অন্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না করেই নিজের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এবং অন্যের স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়তাও করে।

উইন উইন নেগোসিয়েশন বা জয় জয় সমঝোতা একটি প্রক্রিয়া, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্জিত হয় ডায়ালগের মাধ্যমে। ডায়ালগ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্য দিয়ে মত পার্থক্য হ্রাস, কোনো অমিমাংশিত বিষয়ে ঐক্যমত্য সৃষ্টি এবং ঐক্যমত্যের মাধ্যমে এমন এক ফলাফল বের করে আনার চেষ্টা করা হয়, যা সংশি-ষ্টসকল পক্ষের কার্যক্রম পরিচালনা ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হয়।

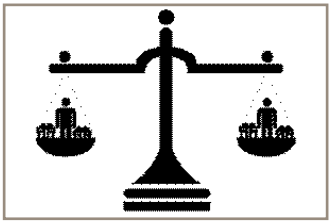

সমঝোতার ধরন

সমঝোতা যদি অসমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তাহলে এর ফলাফল সকল পক্ষের জন্য সমান ও কল্যাণকর হয় না এবং সেক্ষেত্রে সমঝোতার ধরনও হয় ভিন্ন রকমের; যেমন:

১. আমার জয়, তোমার পরাজয়
২. আমার পরাজয়, তোমার জয়
৩. আমার পরাজয়, তোমারও পরাজয়
৪. আমার জয়, তোমার জয়

উপরোলিখিত চার ধরনের সমঝোতা বিশেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত দুই ধরনের ফলাফলে এক পক্ষ জয়ী হয়েছে এবং অন্য পক্ষ পরাজিত হয়েছে। তৃতীয় ফলাফলে উভয় পক্ষই পরাজিত হয়েছে, পক্ষান্তরে চতুর্থ ও শেষ ফলাফলে উভয় পক্ষই জয়ী হয়েছে, যা জয় জয় সমঝোতা বা সকল পক্ষের জয় বলে গণ্য হয়।

জয় জয় সমঝোতার কৌশল

জয় জয় সমঝোতা একটি প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ায় কখনো কখনো এক বা একাধিক অথবা সকল পক্ষকেই অন্যের স্বার্থে কিছু না কিছু ছাড় দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সকল পক্ষই যে সবসময় এই প্রক্রিয়ায় স্বস্তি বোধ করবে বা এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কর্মকৌশল তৈরী করতে চাইবে, তা নাও হতে পারে। সুতরাং এই প্রক্রিয়ার উদ্যোগী পক্ষ এবং পরবর্তীতে সকল পক্ষকেই একটি সফল জয় জয় সমঝোতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে, যেমন:

১. ন্যায়ভিত্তিক ভূমিকা:

মৌলিক স্বার্থ সুরক্ষাসমঝোতা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষেরই কিছু না কিছু মৌলিক স্বার্থ রয়েছে, যার সুরক্ষা না হলে সেই পক্ষ সমঝোতায় আগ্রহী হবেন না এবং সমঝোতা প্রক্রিয়া থেকে বের হয়ে যেতে পারেন।

জয় জয় সমঝোতা প্রক্রিয়ার মূল বিশেষত্বই হচ্ছে, "এমন এক মতৈক্য বা চুক্তিতে পৌঁছায় যার দ্বারা সকল পক্ষই অন্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না করেই নিজের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এবং অন্যের স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়তাও করে"। সুতরাং এক্ষেত্রে চিন্তা করতে হবে যে, এক পক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো অপরপক্ষের উদ্দেশ্যের সাথে পরস্পর পরস্পরের কতটা সম্পুরক বা সাংঘর্ষিক। সুতরাং সমঝোতা প্রক্রিয়ার প্রারম্ভেই অপর পক্ষের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জেনে নিতে হবে। সে-অনুযায়ী বিশেষণ করতে হবে যে, তা নিজেদের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে কতটা সাংঘর্ষিক এবং কতটুকু সম্পূরক। এক্ষেত্রে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক নীতিমালা বিশেষণ করে নিজেদের অবস্থান বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে কৌশলসমূহ নিম্নরূপঃ

- উভয় পক্ষের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শণ
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা বিশেষণ করে নিজেদের অবস্থান তৈরী
- কোনো পক্ষের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যহত হয় এমন বিষয়ে ছাড় না দেয়া

২. পারস্পরিক সহযোগিতা

জয় জয় সমঝোতা প্রক্রিয়ায় সকল পক্ষের স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে সকল পক্ষকেই কিছু না কিছু ছাড় দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে এবং এর দরুণ সকল পক্ষেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে কিছুটা ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ ধরনের অবস্থা সবসময় সকল পক্ষ সানন্দে গ্রহণ করতে প্রস্তত থাকে না। অন্য পক্ষের স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে সকলেরই যেটুকু স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে তা পূরণের লক্ষ্যে সকল পক্ষকেই সচেষ্ট হতে হবে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পক্ষভুক্ত সকলের স্বার্থ সুরক্ষায় প্রতিশ্রুতিও সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এক দিকে যেমন জয় জয় সমঝোতা প্রক্রিয়া তরান্বিত হবে অপরদিকে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমঝোতার কারণে সৃষ্ট ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে।

৩. বিকল্প পছন্দ উপস্থাপন

জয়-জয় সমঝোতা অধিকতর কার্যকর করা সম্ভব হবে, যদি সমঝোতা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দের সামনে একটির পরিবর্তে একাধিক বা বিকল্প পছন্দ উপস্থাপন করা যায়। কেননা একটি পছন্দ বা প্রস্তাব প্রায়শঃই অংশগ্রহনকারীবৃন্দকে বিকল্প চিন্তা করতে অনুৎসাহিত করে। অপরদিকে বিকল্প পছন্দ একটি স্বতঃস্ফুর্ত যোগাযোগ পরিচালনা করে থাকে। ফলশ্রুতিতে সমঝোতা হতে পারে অনেক বেশি উদ্যমী এবং উপযোগী যা একাধিক পছন্দের একটি ফলাফল।

৪. অন্যের সহযোগিতা

তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি সমঝোতা প্রক্রিয়ায় খুবই সহায়ক, তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ও পরামর্শ সমঝোতা প্রক্রিয়ায় পক্ষসমূহের সমঝোতা প্রক্রিয়ায় যে সকল সুফল বয়ে আনে, তা নিম্নরূপ:

- উভয়পক্ষ তাদের সংবেদনশীল বিষয়গুলো তৃতীয় পক্ষের কাছে খোলামেলা আলোচনা করতে পারে।
- কোনো পক্ষ হয়তো আলোচনায় খোলামেলাভাবে তাদের সন্দেহগুলো উপস্থাপন করতে চাচ্ছেন না এক্ষেত্রে তারা তৃতীয় পক্ষের উপর নির্ভর করতে পারেন।
- আলোচনায় অচলাবস্থা দেখা দিলে তৃতীয় পক্ষ পুনরালোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।
- সবশেষে তৃতীয় পক্ষ উভয় পক্ষের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখেন এবং ভুল ও ঝুঁকি প্রশমনের সুযোগ সৃষ্টি করে।

একজন দক্ষ সমঝোতাকারীর যোগ্যতাসমূহ

পারস্পরিক স্বার্থ সংশি-ষ্টবিষয়ে সমঝোতা প্রক্রিয়ায় যে বা যাঁরা অংশগ্রহণ করবেন, তাঁদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রক্রিয়াটিতে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক ভূমিকা রাখে। আলোচনাকারীর ব্যক্তিগত নৈপুণ্য অনেক জটিল সমঝোতা প্রক্রিয়াকেও কার্যকর করে তুলতে পারে। সুতরাং এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমঝোতা প্রক্রিয়ায় আলোচনার জন্য এমন ব্যক্তিবর্গকেই নিয়োজিত

করা উচিৎ যে বা যাঁরা সমঝোতাকারী হিসাবে বিশেষ কিছু যোগ্যতা রাখেন। তিনিই সমঝোতার জন্য যোগ্য যিনি:

আলোচনার পরিবেশকে প্রাণবন্ত, যুক্তিসমৃদ্ধ ও কর্মমুখী করে তুলতে পারেন। সমঝোতাকারীবৃন্দ প্রতিক্রিয়া প্রকাশের চেয়ে সমঝোতা বৈঠক বা আলোচনা যাতে সকল পক্ষের জন্যই স্বস্তিদায়ক হয়, বরং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবেন। তিনি সর্বদাই সমঝোতা বৈঠক বা আলোচনা **SMART**এর আ লোকে জয়্নজয় সম ঝোতার সীমানায় পৌঁছে দিতে পারবেন। অর্থাৎ কৌশলী ও যোগ্য আলোচকবৃন্দ সমঝোতাকে জয়্নজয় সমঝোতায় রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে যা করবেন, তা হচ্ছে,

১. **সুনির্দিষ্ট (Specific):** আলোচনা হবে সুনির্দিষ্ট ইস্যুতে এবং ফলাফল বা সমঝোতা চুক্তিও হবে সুনির্দিষ্ট।

২. **পরিমাপযোগ্য (Measurable):** সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে সকল পক্ষের অর্জনই যেন হয় পরিমাপযোগ্য। সমঝোতা চুক্তিতে যদি সমঝোতার মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলের সূচকগুলিকে চিহ্নিত করে নেওয়া যায় (কি ও কতটুকু অর্জিত হবে) তাহলে পরবর্তীতে পরিমাপ করা সহজ হয় ।

৩. **অর্জনযোগ্য (Achieveable):** সমঝোতা চুক্তিতে উল্লেখিত টার্গেটসমূহ যেন অর্জনযোগ্য হয়।

৪. **বাস্তবসম্মত (Realistic):** জয়্নজয় সম ঝোতার প্রতিটি শর্ত হবে বাস্তবসম্মত।

৫. **সময়ানুবর্তী (Time-bound):** সুনির্দিষ্ট উদ্যোগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ফললাভের জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট সময়সীমা।

সমঝোতাকারীবৃন্দ শুরু থেকেই 5 W & 1 H এর আলোকে চিন্তা করতে পারেন অর্থাৎ,

১. কী (What) : কোন পক্ষের কী চাওয়া, তা চিহ্নিত করা

২. কেন (Why) : কেন এই চাওয়া? কী কী সমস্যা দেখা যাচ্ছে, তা চিহ্নিত করা

৩. কাদের (Whom) : কে কে বা কোন কোন সংগঠন/পক্ষ এই ইস্যু সংশ্লিষ্ট

৪. কখন (When) : সমঝোতা চুক্তি বাস্তবায়ন কখন থেকে শুরু হবে,

৫. কোথায় (Where): পক্ষসমূহের অবস্থান চিহ্নিত করা

৬. কিভাবে (How) : কীভাবে এমন সমাধানে পৌঁছানো যায় যা সকলের জন্য স্বস্তিদায়ক এবং গ্রহণযোগ্য

ব্যক্তিগত দক্ষতা

জয়্লজয় সম ঝোতার জন্য ব্যক্তিগত দক্ষতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জয়্লজয় সমঝোতার একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে এখানে উভয় পক্ষই একটি ভালো ফলাফলের প্রয়োজন অনুভব করে। সবচেয়ে ভালো ফলাফলের জন্য উভয় পক্ষই জয়্লজয় সম ঝোতা একটি পারস্পরিক সহযোগিতামূলক আচরণ হিসেবে নিতে পারে যেখানে বৈরীতা কোনো স্থান পাবেনা। সুতরাং এক্ষেত্রে সমঝোতাকারী তাদের ব্যক্তিগত দক্ষতার মাধ্যমে জয়্লজয় সম ঝোতাকে একটি সহযোগিতামূলক পরিবেশে রূপান্তর করতে পারে। উল্লেখ্য, নিম্নের তিনটি পদ্ধতি এক্ষেত্রে খুবই উপযোগী

১. শ্রবণ করা

উভয় পক্ষই সমঝোতার কিছু ধারণা নিয়ে আসে এবং উভয় পক্ষই চায় একে অন্যের ধারণা ও প্রস্তাব শুনতে এবং শুনাতে। যদি উভয় পক্ষই শ্রবণ ক্ষমতায় দক্ষ হয় সেক্ষেত্রে সমঝোতায় সফল হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি থাকে।

২. অপরপক্ষের সমস্যা ও ধারণা আলোচনার এজেন্ডায় নিয়ে আসা

সমঝোতাকারীবৃন্দ একে অপরের সমস্যা ও ধারণা শ্রবণ করবেন এবং তা স্বীকার করবেন। সমঝোতাকারীদের উচিৎ সকল ধারণা ও প্রস্তাব খুবই সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করা। সমঝোতাকারীবৃন্দ "এটি একটি খারাপ প্রস্তাব" বলার চেয়ে বরং বলতে পারেন যে "এটি একটি প্রস্তাব, তবে এর চেয়ে ভালো প্রস্তাব আছে আসুন তা আমরা খুঁজে দেখি"।

৩. দ্বন্দ্বকে সমঝোতায় রূপান্তর

আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি সমঝোতা ও সমাধান প্রত্যাশা করা হচ্ছে, যা উভয়ের জন্যই কল্যাণকর। সুতরাং যে সকল বিষয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে, সে সকল বিষয়াদিকে সমঝোতায় রূপান্তরিত করার পথ উন্মুক্ত করাই সমঝোতাকারীবৃন্দের লক্ষ্য এবং দায়িত্বও বটে। এক্ষেত্রে তিনিই যোগ্য ও কৌশলী সমঝোতাকারী যিনি উভয়ের মৌলিক স্বার্থ ও চাহিদা ক্ষুণ্ন না হয় এমন প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারবেন, বিভাজনের পরিবর্তে সমঝোতার পরিবেশ তৈরী করতে পারবেন।

একজন দক্ষ সমঝোতাকারী আলোচনার সময় যা করবেন না:

১. অপ্রাসঙ্গিক, ব্যক্তিগত বিষয়াদির অবতারণা

২. অন্য পক্ষের দুর্বল ও স্পর্শকাতর বিষয়ে কথা বলা

৩. অনুচ্চ অথবা অতি উচ্চ স্বরে কথা বলা

৪. কথা বলার সময় অশোভন অঙ্গভঙ্গি

৫. প্রতিপক্ষের কথা বলার সময় অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নিজের সমর্থন অথবা ন্মরাজী ম নোভাব প্রকাশ

৬. প্রতিপক্ষের কথা বলার সময় অমনোযোগী ভাব প্রকাশ

৭. বিরক্তি, তাচ্ছিল্য অথবা উষ্মা প্রকাশ

৮. আক্রমনাত্মক মনোভাব প্রকাশ অথবা ভাষা প্রয়োগ

৯. দীর্ঘ আলোচনায় সমঝোতার প্রতি হতাশা প্রকাশ

১০. আলোচনা অথবা সমঝোতা ত্যাগের ইচ্ছা অথবা হুমকি

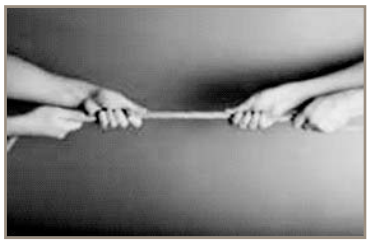

দ্বন্দ

সমঝোতা

দ্বন্দকে সমঝোতায় রূপান্তর

দ্বন্দকে সমঝোতায় রূপান্তরের লক্ষ্যে সমঝোতাকারীবৃন্দের যা করতে হবে তা নিম্নরূপ

সমঝোতার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে করণীয়	সমঝোতা চলাকালীন করণীয়	সমঝোতা পরবর্তী সময়ে করণীয়
১. সমঝোতার জন্য ভালোমত প্রস্তুতি গ্রহণ করা। ২. সমঝোতায় বসার আগে আচরণ্গবিধি, ঘটনা ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি ভালোমত জেনে ও বুঝে নিতে হবে। ৩. জয়্নজয় সমাধান খুঁজে বের করা। ৪. সর্বাধিক ও ন্যূনতম কি অর্জন করা যাবে তা বিশ্লেষণ করা এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা। কোন কোন বিষয় কোনোমতেই 'ছাড়' দেয়া সম্ভব না, তা সুনির্দিষ্ট করা। এর মধ্য থেকে অন্তত একটা বিষয় নির্দিষ্ট করা, যা সৌজন্যতা বা সুনাম সৃষ্টির জন্য 'ছাড়' দেওয়া যেতে পারে। ৫. কয়েকটি যুক্তি বেছে নেওয়া, যা আপনার অবস্থান তুলে ধরতে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করবে।	১. অন্য পক্ষের মতামত বা বিষয়সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা। উভয়ের স্বার্থ রক্ষা হয়, এ ধরনের বিষয় চিহ্নিত করার জন্য চেষ্টা করা। ২. বিশ্বাস বজায় রেখে সমঝোতা করা। আপনি যে একটা 'সমঝোতায়' পৌঁছাতে আন্তরিক, তা অন্য পক্ষকে বুঝতে দেওয়া। ৩. নিজের অবস্থান স্পষ্ট ও সুন্দর করে উপস্থাপন করা। অন্য পক্ষের অবস্থান বা বিষয় পরিপূর্ণভাবে বুঝা এবং আপনি যে বুঝতে চেষ্টা করছেন, তা বুঝতে দেওয়া। ৪. অন্য পক্ষের সামনে কখনোই নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি এবং কোনো বিষয়ে দ্বিমত প্রদর্শন না করা। ৫. যে বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়েছেন, আলোচনা বা সমঝোতা সেই দিকে প্রবাহিত করা। অনেক সময় প্রসঙ্গ অন্যদিকে চলে যায় বা নিয়ে যাওয়া প্রবণতা দেখা যায়। আলোচনা অন্যদিকে মোড় নিলে বা পরিবেশ গুমোট অথবা উত্তপ্ত হয়ে উঠলে হালকা কৌতুকরসবোধ ব্যবহার করা।	১. কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছালে তা পুনরায় তুলে ধরা। অবশ্যই তা লিখিতভাবে রাখা। ২. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যে দু'পক্ষের করণীয় বা কর্ম্মপরিক ল্পনা তৈরি করা। ঠিক পরপরই কী বা কোন্ পদক্ষেপ নিতে হবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়া। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোনো ঝামেলা দেখা দিলে তা কীভাবে দু'পক্ষ মিলে সমাধান করবে তা সমঝোতায় লিপিবদ্ধ করা। ৩. শেষ করার আগে নিশ্চিত হওয়া যে, দলের সকল সদস্য সব সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একমত। ৪. ফলাফল কী হলো সেটা নিয়ে অনুশোচনা না করা, যা অর্জন হয়েছে তাই নিয়ে সামনে আগানোর জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে পরবর্তী ধাপ হতে পারে 'আরেকটি বৈঠক'।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে জ্ঞান ব্যবস্থাপনা

যে কোনো প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সফলতা ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে বিশ্বের প্রচলিত নানা কৌশলের মধ্যে জ্ঞান ব্যবস্থাপনাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। বিশ্বায়নের এই যুগে উন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন অনেকটাই জ্ঞান নির্ভর। তাই বিশ্ব অর্থনীতির সাথে জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিষয়টি ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। জ্ঞান ব্যবস্থাপনা হলো কিছু সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার সমন্বিত রূপ যা সরাসরি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান সৃষ্টি, বিস্তার ও ব্যবহারের সাথে জড়িত। আর যে সকল বিশেষজ্ঞ জ্ঞান সৃষ্টি, বিস্তার ও ব্যবহার করে সমাজের উন্নয়নে কাজ করেন, তাঁরা হলেন্নদার্শনিক, পুরোহিত, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, লেখক, বিজ্ঞানী, গবেষক ইত্যাদি। তবে জ্ঞান ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার জন্য যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন তা হল্মে

- জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরী ও সম্প্রসারণ
- জ্ঞানে অভিগম্যতা সৃষ্টি এবং জ্ঞানের প্রবাহ নিশ্চিতকরণ
- জ্ঞানসমৃদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি এবং
- জ্ঞান ব্যবস্থাপনাকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা

জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরী ও সম্প্রসারণ বলতে যা বোঝায় তা হলো, পুরনো জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে নতুন কিছু আবিষ্কার করা। বিজ্ঞানের সহায়তায় যে সকল দেশ নতুন কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে তারাই আজ বিশ্বের মানচিত্রে উন্নত দেশ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছে; তাই জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরী ও সম্প্রসারণ নতুন কিছু আবিষ্কার হলো উন্নয়নের প্রধান শর্ত।

জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরী ও আবিষ্কার সমাজের উন্নয়ন ধারাকে তরান্বিত করে তখনই, যখন সেই জ্ঞান ভান্ডারে সাধারণ মানুষের অভিগম্যতা সৃষ্টি হয় অর্থাৎ জ্ঞান চর্চার অধিকার সমাজের সকল স্তরের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে যায় এবং তার সুফল সকলেই ভোগ করে। তাই শুধু জ্ঞান সৃষ্টি নয় এর অভিগম্যতা নিশ্চিত করাও জ্ঞান ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

জ্ঞানসমৃদ্ধ পরিবেশ উন্নত সমাজের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সেখানে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হয় এবং জ্ঞানভান্ডারে সাধারণ মানুষের অভিগম্যতাও থাকে অবাধ। সুতরাং জ্ঞান সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে পরিচিত হতে হলে জ্ঞানসমৃদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া বাঞ্চনীয়; অর্থাৎ সেখানে জ্ঞান চর্চার অবাধ পরিবেশ থাকতে হবে। জ্ঞান চর্চার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে এবং বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ মানুষ সকলেই জ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত করবে। এটাই কেননা জ্ঞান চর্চার অবাধ পরিবেশ।

সবশেষে আসে জ্ঞান ব্যবস্থাপনার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো সমাজ জ্ঞান ব্যবস্থাপনাকে একটি পৃথক বিষয় হিসেবে নিশ্চিত করতে পারে না ততক্ষণ পর্যন্ত তার উন্নয়নের পথ নিশ্চিত হয় না। তাই জ্ঞান ব্যবস্থাপনা যে সমাজ বা দেশের জন্য অফুরন্ত সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে পারে, এই বোধটি সকলের মধ্যে জাগ্রত হলেই সেই দেশ ও জাতি নিশ্চয় সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

বিশ্ব অর্থনীতি এখন জ্ঞান নির্ভর। তাই বিশ্ব অর্থনীতির উন্নয়নের লক্ষেই জ্ঞান ব্যবস্থাপনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা লক্ষ্যণীয় যে, বিশ্বে জ্ঞানে'র ব্যাপ্তি জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একই সাথে আয় ও সম্পদের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে দেশে ও সমাজে জ্ঞান সৃষ্টি এবং চর্চা যত কম, সেখানে আয় ও সম্পদের পরিমাণও কম। জ্ঞান সৃষ্টির সাথে দক্ষতার প্রশ্নটিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। যে দেশে ও সমাজে জ্ঞান সৃষ্টি এবং চর্চা যত বেশী কারিগরী উৎকর্ষতাও সেখানে অনেক বেশী।

বর্তমান যুগে ব্যক্তির কর্মক্ষমতা এবং দক্ষতা ব্যক্তির জ্ঞানের গভীরতা, মূল্যবোধ, কর্মক্ষেত্রের উপযুক্ততা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। আর এ সব কিছু নির্ভর করছে জ্ঞান চর্চার উপর। তবে জাতি হিসেবে উন্নয়নের লক্ষ্যে শুধু জ্ঞানার্জনই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান ব্যবস্থাপনা। সঠিক জ্ঞান ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব সমাজের অভ্যন্তরের সকল ব্যক্তির কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার কার্যকর ব্যবহার। যদিও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা আধুনিক সমাজে একটি নতুন ধারণা কিন্তু আদিম সমাজেও মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে জ্ঞান বিতরণ ও জ্ঞানের চর্চা করেছে। কিন্তু তারাই সফলতা পেয়েছে যাদের জ্ঞান ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমটি ছিল সঠিক ও সুনির্দিষ্ট। তবে আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের

সহায়তায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতির কারণে ব্যাপকভাবে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে, যা জ্ঞান ব্যবস্থাপনায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

জ্ঞান ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্ঞানের ভান্ডারে জনসাধারণের অভিগম্যতা নিশ্চিত করাও জ্ঞান ব্যবস্থাপনার একটি কৌশল বা ধাপ। এমন একদিন ছিল যখন জ্ঞানার্জন আর জ্ঞান চর্চার অধিকার ছিল শুধু অভিজাত শ্রেণীর, কিন্তু জ্ঞানের ভান্ডারে একটি শ্রেণীর অভিগম্যতাই যথেষ্ট নয়। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে জ্ঞান ব্যবস্থাপনার ধারণাটি কার্যকর হয়েছে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। তাই জ্ঞান ব্যবস্থাপনায় এই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যাতে সকল স্তরে জ্ঞানের আলো সঠিকভাবে পৌছায় এবং তা ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজ লাভবান হয়।

জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কোনো প্রযুক্তিগত বিষয় নয়, যদি আমরা এই ধারণা মেনে নেই তাহলে জ্ঞান ব্যবস্থাপনাকে বিবেচনা করা হয় জ্ঞান সাধন, জ্ঞান বিস্তার ও জ্ঞানের সঠিক ব্যবহারের একটি উত্তম উপায় হিসেবে। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে জ্ঞান ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তিগত বিষয়ের চেয়ে অনেক বিস্তৃত একটি ধারণা যা আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজের সাথে জড়িত। তবে জ্ঞান ব্যবস্থাপনাতে কিছু ধাপ অনুসরণ করাও বাঞ্ছনীয়। যেমন্ন

ধাপ্ন১ সমস ্যা সনাক্তকরণ
ধাপ্ন২ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হওয়া
ধাপ্ন৩ জ্ঞান ব্যবস্থাপনা দল গঠন
ধাপ্ন৪ জ্ঞান বিশ্লেষণ
ধাপ্ন৫ সমাধা নের উপায় নির্ধারণ
ধাপ্ন৬ জ্ঞান ব্যবস্থাপনার জন্য ইস্যু সুনির্দিষ্টকরণ
ধাপ্ন৭ জ্ঞানভান্ডার বা knowledge Bank-এ সকল মানুষের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ

যেকোনো কাজের তাগিদ শুরু হয় কোনো সমস্যা থেকে। তাই সমস্যা সনাক্তকরণ একটি অন্যতম প্রধান কাজ। তবে সমস্যা সনাক্তকরণ যে খুব সহজ কাজ তা নয়, কখনো কখনো সমস্যা সনাক্তকরণই সফলতার পথে বাধা হয়ে দাড়ায়। তাই যেকোনো কাজে সফলতা অর্জনের জন্য প্রথমেই

খুঁজে বের করতে হবে সমস্যাটা কোথায়? আর কোথায় লুকিয়ে আছে মানব জীবনের অভাব ও চাহিদা। সমস্যা সনাক্তকরণ হয়ে গেলে প্রয়োজন তার পরিবর্তন সাধন। কিন্তু তার আগে প্রয়োজন পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হওয়া, অর্থাৎ সমাজের অগ্রসর চিন্তার কিছু মানুষকে সমাজ পরিবর্তনের জন্য মানসিক ও শারিরীকভাবে প্রস্তুত হতে হবে অন্যথায় সেই সমাজে পরিবর্তন আসলেও তা বেশি দিন টিকে থাকে না। তাই সমাজের লোকদের পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত করার পর গড়ে তুলতে হবে এমন একটি দল যারা জ্ঞান ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ করবে। দল গঠনের পরবর্তী কাজ হলো জ্ঞান বিশ্লেষণ, কেননা যেকোনো সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে আসবে নতুন জ্ঞান আর নতুন জ্ঞান আসবে পুরাতন কোনো জ্ঞানের হাত ধরে। বর্তমানেই লুকিয়ে থাকে ভবিষ্যতের জ্ঞান যা পাওয়া সম্ভব পুরাতন জ্ঞান বিশ্লেষণ করে। জ্ঞান বিশ্লেষণ সফলভাবে সম্পন্ন হলে সমাধানের উপায় বের হয়ে আসবে। তবে মনে রাখতে হবে পূর্বের জ্ঞান বিশ্লেষণ না করে কোনোভাবেই সমাধানের উপায় নির্ধারণ করা যাবে না। এর পরবর্তী ধাপ হলো সমস্যার সমাধান এবং সেখান থেকে জ্ঞানীয় বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টকরণ। যেহেতু সমস্যা থেকেই জ্ঞানের সৃষ্টি তাই যখন কোনো সমস্যার সমাধান হবে সেখান থেকে বের হয়ে আসবে নতুন কোনো জ্ঞান, যা পৌঁছে দিতে হবে সমাজের প্রতিটি স্তরে।

জ্ঞান ব্যবস্থাপনার এই ধাপগুলো অনুসরণ করে একজন নেতাও পারেন সমাজের কল্যাণ বয়ে আনতে। এর মাধ্যমে তিনি পারেন্ন তাঁর সংগঠন বা কমিউনিটির সমস্যা সনাক্তকরণপূর্বক তার সমাধান, জ্ঞান চর্চা এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের সফলতার পথটিকে সহজ ও সুনিশ্চিত করতে।

মানব সভ্যতা টিকেই আছে এই জ্ঞান ব্যবস্থাপনার সফলতার জন্যে। সেই সমাজ উন্নয়নের গতি তরান্বিত করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে পেরেছে যারা সঠিকভাবে জ্ঞান ব্যবস্থাপনা করতে সক্ষম হয়েছে। তাই একজন উন্নয়নশীল দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের উচিৎ জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিষয়টির দিকে মনোযোগ দেওয়া যা আমাদের সমাজ ও দেশের জন্য কল্যাণকর।

নেতৃত্বে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি কী

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে সাধারণভাবে এমন সকল প্রযুক্তিকেই বোঝায়, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী তথ্যে প্রবেশাধিকার ও প্রাপ্ত তথ্য প্রয়োগের সুযোগ লাভ করে। 'তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি' তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বিত রূপ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রেবাণিজ্য থেকে বিশ্রাম এবং এমনকি সংস্কৃতি পর্যন্ত দখল করে আছে। বর্তমান যুগে মোবাইল ফোন, ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ কম্পিউটার, হস্তচালিত প্রযুক্তিসমূহ, ই মেইল ও ইন্টারনেট, সেবা আমাদের সংস্কৃতি ও সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদেরকে একটি বৈশ্বিক সমাজে রূপায়িত করেছে, যেখানে জনসাধারণ অতি দ্রুত ও দক্ষতার সাথে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ ও ভাববিনিময় করতে পারে। তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ভাষাগত বৈষম্য বিলোপে অবদান রেখেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উদাহরণস্বরূপ, ই মেইল, তাৎক্ষণিক বার্তা প্রদান, চ্যাটরুম এবং ফেসবুক ও টুইটারের মত সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটগুলো, স্কাইপি, আই ফোন, সেলুলার ফোন এবং সমধর্মী প্রযুক্তিগুলোর উল্লেখ করা হয়।

এসব প্রযুক্তি ব্যবহারে একটি অসুবিধার দিক হলো বর্তমানের ক্রমপরিবর্তনশীল প্রযুক্তিগুলির সাথে পুরনো প্রজন্মের অনেকেই খাপ খাওয়াতে পারছেন না। পরিবর্তনকে প্রতিহত করার মত মনোভাব এবং ক্রমঅগ্রসরমান প্রযুক্তি বিকাশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর অসামর্থ্য এক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়। আবার বর্তমান সমাজের অনেকেই প্রযুক্তির সুযোগসুবিধা কাজে লাগানোর পর্যায়ে নেই। হতে পারে দারিদ্র, ভৌগলিক অবস্থান কিংবা প্রযুক্তি ব্যবহারে তাদের অভিগম্যতার অভাব এর কারণ।

নেতৃত্বে প্রযুক্তির ব্যবহার

প্রয়োজনের খাতিরে তৎক্ষণাৎ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারা নেতৃত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা নেতৃত্বের গুণাবলীতে নতুন মাত্রা সংযোজন করে।

নেতা যাতে সহজেই যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে নিতে পারেন সেজন্য নানা ধরনের প্রযুক্তি তাকে সাহায্য করতে পারে কিন্তু সাহায্য গ্রহণের জন্য নেতার সেই পরিমাণ প্রযুক্তিগত শিক্ষা থাকাও জরুরী। সত্যিকার অর্থেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই কার্যকর কিন্তু প্রযুক্তির ব্যবহার কার্যকর হবে তখনই যখন এর সফল ও সঠিক ব্যবহার সম্ভব হবে। সকল ব্যবস্থাপনা স্তরেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির ব্যবহার সমগ্র বিশ্বেই এখন স্বীকৃত এবং বহুল ব্যবহৃত। তবে এ কথাও বিবেচ্য যে, প্রযুক্তির মধ্যে তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তিই উন্নয়নশীল সমাজে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

নেতৃত্বে সফলতা অর্জনে যে কোনো তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম কেননা তথ্য ছাড়া আধুনিক সমাজ কল্পনা করা যায় না। এমন একদিন ছিল যখন সঠিক তথ্য জানার পথ ছিল দুর্গম এবং সঠিক তথ্যের অভাবে সহজ কাজ করাও ছিল অসম্ভব, এরকম ঘটনা এখন চিন্তা করা যায় না কারণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যে পরিমাণ উন্নয়ন সাধন ঘটেছে তাতে মানব জীবনের প্রায় প্রতি স্তরেই সঠিক ও সর্বশেষ তথ্যটি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। তাই একজনা সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের উচিৎ সঠিক ও সর্বশেষ তথ্যের অনুসন্ধান করা। একজন নেতা হিসেবে অবশ্যই তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরী যেন যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এমন কোনো প্রভাব না পড়ে যা উক্ত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্যের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

তথ্য প্রযুক্তি যেভাবে একজন নেতাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতে পারে–

১. দ্রুত, সঠিক ও সর্বশেষ তথ্য দিয়ে

বর্তমান ইন্টারনেট, ইমেইল, ওয়েবসাইট, ফেইসবুক, টুউটার ইত্যাদি নানা উৎস থেকে দ্রুত, সঠিক ও সর্বশেষ তথ্য পাওয়া বেশ সহজসাধ্য। এমন একদিন ছিল যখন আজ ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার তথ্য পেতে দেশের মধ্যেও সময় লাগতো কমপক্ষে এক দুই দিন, আর দেশের বাইরের মাস কিংবা বছর। এমনও অনেক ঘটনা আছে সঠিক

ও সহজসাধ্য প্রযুক্তির অভাবে তা কখনই বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছায়নি, যা এই ইন্টারনেটের এই আধুনিক যুগে চিন্তাও করা যায় না। কোথাও ভূমিকম্প হয়েছে? কয়েক মিনিটের মধ্যেই কোথায়, কখন, কত মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে তা জানা যায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে। আগামীকাল বৃষ্টি হবে কি হবে না, চাইলেই তা জানা যায় টিভি, রেডিও ও ইন্টারনেটের বদৌলতে। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের খবর, কিংবা কোনো তথ্য, মানচিত্র এমনকি পুরো বই পর্যন্ত পাওয়া যায় ইন্টারনেটভিত্তিক সার্চ ইঞ্জিনে। তাই সঠিক, সর্বশেষ এবং দ্রুত তথ্য পাবার ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির এই উন্নত রূপ বিশ্ববাসীর কাছে আশীর্বাদস্বরূপ।

২. যেকোনো সমস্যার ইতিহাস পর্যালোচনা করে

সমস্যায় জর্জরিত মানব জীবন। কিন্তু কাল যে সমস্যা ছিল সমাধানের অযোগ্য হয়তো আজ পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে আবিষ্কৃত হয়েছে তার সমাধান কিংবা যে এই সমস্যায় পড়েছে তার অভিজ্ঞতাই বলে দিচ্ছে সমাধানের উপায় যা পূর্বে কল্পনাও করা যেত না। ভূমিকম্প কিংবা অগ্নিকান্ড এমন দুটি দুর্ঘটনা যা কবে, কখন কিভাবে আসবে আমরা কেউ বলতে পারি না। কিন্তু আমরা জানতে পারি এসকল দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে আমাদের করণীয় কী। আর এটা সম্ভব হয়েছে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায়; কারণ তথ্য প্রযুক্তি আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে সেই সকল তথ্য যেখানে অতীতে ঘটে যাওয়া সকল দুর্ঘটনার বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত আছে।

৩. জটিল বিষয়গুলো সহজ উপায়ে উপস্থাপন করে

এমন একটা সময় ছিল যখন অনেক তথ্য কিংবা কোনো সমস্যার সমাধান কেবল গ্রন্থ বা গবেষণাপত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। আজ তা সহজে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তথ্য মাধ্যমে এমন কিছু উৎসের সৃষ্টি হয়েছে যা সকল স্তরের সকল বয়সের সকল বুদ্ধিমত্তার মানুষকে সহায়তা করছে। টিভি, রেডিও, ওয়েবসাইট, সার্চ ইঞ্জিন ইত্যাদির সহায়তায় কঠিন জিনিস উপস্থাপিত হচ্ছে সহজভাবে যেন তা

জনসাধারণের কাছে বোধগম্য হয়। একজন নেতা তথ্য প্রযুক্তির এই আশীর্বাদকে গ্রহণ করে কঠিন বিষয়গুলো নিজে বুঝতে পারেন এবং কমিউনিটির সকল স্তরের ব্যক্তিকে বুঝতে সহায়তা করতে পারেন।

৪. দূরত্ব কমিয়ে এনে

দূরত্ব এক সময় ছিল মানব সমাজের অন্যতম বড় বাধা। কিন্তু মোবাইল ফোন আর ইন্টারনেটের যুগে দূরত্ব নামক বাধাটি আজ অতীতমাত্র। তথ্য প্রযুক্তি এই বাধা জয় করেছে বহু আগে। আজ দূরত্ব কোনো সমস্যাই নয়। বিশ্বে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যোগাযোগ করা আজ কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। একজন নেতাও তার কর্মজীবনে কমিউনিটির মঙ্গল কামনায় দূরত্ব নামক বাধাটি জয় করে তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেন।

৫. জরুরী অবস্থায় দ্রুত তথ্য সরবরাহ করে

মানব জীবনে প্রায়শই কিছু জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন দ্রুত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সেই জরুরী অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় অথবা ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা যায়। আমাদের দেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় প্রায়ই এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে সাইক্লোন এবং সুনামির পূর্ব মুহূর্তে, যখন একটি সতর্ক সংকেত হাজারো প্রাণ রক্ষা করে এবং আসন্ন বিপদের ক্ষয় ক্ষতি কমিয়ে আনার ক্ষমতা রাখে। একজন নেতা যদি এধরনের জরুরী অবস্থায় দ্রুত জরুরী সংবাদ সংগ্রহ ও কমিউনিটিতে প্রচার করতে সক্ষম হন তবে তার কমিউনিটির সুনামি কিংবা সাইক্লোনের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পদ্ধতিসমূহ

১. জিআইএস কি ?

জিআইএস বা Global Information System হচ্ছে সকল ধরনের ভৌগোলিক তথ্যাবলী সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা, বিশ্লেষণ ও

উপস্থাপনের জন্য হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও উপাত্ত একীভূতকরণের ব্যবস্থাই। এই প্রযুক্তি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের তথ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সঙ্গে সমন্বিত হতে পারে।

২. ডিজিটাল ম্যাপিং: একে "ডিজিটাল কারটোগ্রাফীও" বলা হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্ত একত্রিত করে কম্পিউটার ভিত্তিক ইমেজে রূপান্তরিত করা হয়। এই প্রযুক্তির প্রাথমিক কাজ হলো কোনো নির্দিষ্ট এলাকার মানচিত্র উপস্থাপন যাতে সুনির্দিষ্টভাবে রাস্তাঘাট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ প্রদর্শিত হয়। এই প্রযুক্তি কৌশলের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানের দূরত্বও নির্ধারণ করা হয়।

'গুগল আর্থের' মত নানাধরনের কম্পিউটারভিত্তিক ব্যবস্থায় ডিজিটাল মানচিত্র পাওয়া গেলেও, এর মূল ব্যবহার হয় গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম বা জিপিএস স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কে।

৩. ওয়েবসাইট: একটি ওয়েবসাইট প্রধানত ছবি, ভিডিও বা অন্যান্য ডিজিটাল উপকরণের ওয়েবপেজের সমষ্টি। কমপক্ষে একটি ওয়েব সার্ভারে এটি ধারণকৃত এবং কোনো ইন্টারনেট ঠিকানার মাধ্যমে ইন্টারনেট বা প্রাইভেট লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী হয়। সর্বসাধারণের অভিগম্য সকল ওয়েবসাইট সম্মিলিতভাবে গঠন করে ওয়ার্ল্ডওয়াইড ওয়েবপেজ যা HTML বা হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাংগুয়েজের নির্দেশনায় লিখিত। উপযোগী ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি ওয়েবপেজ অন্য ওয়েবসাইট থেকেও উপকরণ গ্রহণ করতে পারে।

৪. UHF বনাম VHF :

বেতার তরঙ্গপ্রবাহের এই দুটি পদ্ধতি UHF ও VHF দ্বিমুখী বেতার ব্যবস্থার দুটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। বেতার তরঙ্গের এই অংশ ব্যাপকভাবে সম্প্রচারে ব্যবহৃত হয়। বেতারের অবিচ্ছিন্ন ও কার্যকর প্রবাহ ঠিক রাখার স্বার্থে রেডিও ব্যবহারকারীদের

নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বেতার তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা। বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের জন্য উভয় ব্যান্ডই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

UHF এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Wavelength) ক্ষুদ্রতর যা উচুঁ নিচু এলাকা কিংবা কোনো ভবনের অভ্যন্তরে সিগন্যালের নির্দেশনার জন্য সহজতর। পক্ষান্তরে VHFএর তর ঙ্গ দৈর্ঘ্য (Wavelength) দীর্ঘতর; স্বাভাবিক অবস্থায় যার সম্প্রচার পরিসীমা দীর্ঘ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ক্ষুদ্রতর বেতার তরঙ্গ বেশি পরিসীমার জন্য উপযোগী। একটি সম্প্রচারিত টিভি স্টেশনের ক্ষেত্রে এটি দেখা যায়। একটি স্বাভাবিক/আদর্শ VHF স্টেশন ১০০,০০০ ওয়াটে চালু হয় এবং ৬০ মাইল ব্যাসার্ধ জুড়ে সম্প্রচারিত হয়। অনুরূপ ব্যাসার্ধ সম্প্রচার সীমার জন্য একটি UHF স্টেশনের জন্য প্রয়োজন হয় ৩০০,০০০ ওয়াট।

৫. কমিউনিটি রেডিও

বাণিজ্যিক সম্প্রচার বা সরকারী সম্প্রচারের বাইরে কমিউনিটি রেডিও তৃতীয় ধারার একটি বেতার সম্প্রচার মডেল। কমিউনিটি রেডিও স্টেশন কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসীমার জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করতে পারে। এসকল স্টেশন স্থানীয় বা কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর চাহিদার নিরিখে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে, যা বাণিজ্যিক বা সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় থাকেনা।

কমিউনিটি রেডিও যে জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করে, সেই জনগোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত ও তাদের মালিকানাভুক্ত থাকে। কমিউনিটি রেডিও অলাভজনক ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং ব্যক্তি, জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বহুমাত্রিক ও বৈচিত্রপূর্ণ গল্প ও অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে এবং গণমাধ্যম সমৃদ্ধ বিশ্বে গণমাধ্যমের উন্নয়নে সৃজনশীল অবদান রাখে। বিশ্বের অনেক এলাকায় কমিউনিটি রেডিও জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও সম্প্রচার লক্ষ্য পূরণে জনগোষ্ঠী, স্বেচ্ছাসেবী, সুশীল সমাজ, এনজিও ও নাগরিকদের সাথে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে কাজ করে থাকে।

সম্পদ সমাবেশীকরণে নেতৃত্বের ভূমিকা

সম্পদ

সম্পদ হলো এমন এক উৎস বা সরবরাহ যা দ্বারা ব্যক্তি, জনগোষ্ঠী, সংগঠন বা রাষ্ট্র লাভবান হতে পারে। সাধারণ অর্থে যে বস্তু মানুষের চাহিদা পূরণে সক্ষম তাকেই সম্পদ বলে। যদিও সম্পদ বিষয়ক ধারণা অর্থনীতি, ও সমাজবিজ্ঞান এক নয়। প্রথাগত অর্থনীতির ভাষায় যে বস্তুর আর্থিক মূল্য আছে তাকেই সম্পদ বলে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে সম্পদের ধারণা অনেক ব্যাপক। সমাজবিজ্ঞানে সম্পদ বলতে শুধুমাত্র আর্থিক মূল্যমানযুক্ত বস্তুই নয় বরং মানবসম্পদ এবং সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও বিশ্বাসকেও সম্পদ বলে গণ্য করা হয়। সমাজে এমন অনেক কিছুই রয়েছে, যার নগদ মূল্যমান নেই কিন্তু সামাজিক উন্নয়নের জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখে তাকেও সম্পদ বলা যায়। তাই সম্পদ যে সবসময় পার্থিব হবে তা বলা যায় না, কারণ সমাজে এরকম অনেক অপার্থিক বস্তুও থাকে যা সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম যেমন্ন শিক্ষা, জ্ঞান, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, ইত্যাদি। তাই পার্থিব সম্পদের (যেমন্ন অর্থ, জমি, মূল্যবান ধাতু/পাথর, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি) পাশাপাশি সমাজের কার্যকর উন্নয়নের জন্য অপার্থিব বিষয়াদিকেও সম্পদ বলে গণ্য করা উচিৎ। আধুনিককালে অর্থনীতিবিদগণও এগুলোকে সম্পদ বলে গণ্য করছেন।

বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সম্পদ প্রধানত দুই ধরনের।

১. আর্থিক ও ভৌত সম্পদঃ জমি, ঘরবাড়ী, খামার, শিল্প কারখানা ইত্যাদি
২. মানবিক সম্পদঃ শিক্ষা, জ্ঞান, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা, তথ্য ইত্যাদি

এছাড়াও সম্পদের মালিকানা বিবেচনা করলে সম্পদকে প্রাথমিক ভাবে ৩টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন্ন

সম্পদ সমাবেশ

উন্নয়নের জন্য চাই যথেষ্ট মাত্রার সম্পদ প্রবাহ। কিন্ত উন্নয়নশীল দেশে বিশেষত আমাদের মত অধিক জনসংখ্যা, সীমিত জমি এবং ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনে দরকার যথেষ্ট মাত্রায় সম্পদ প্রবাহ। কিন্ত সম্পদ প্রবাহ প্রায়শই প্রত্যাশিত মাত্রায় হয় না। এই প্রেক্ষাপটে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে সম্পদ সমাবেশীকরণ তত্ত্ব সরকার এবং বেসরকারী পর্যায়ে আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সম্পদ সমাবেশীকরণ তত্ত্বের মূল বার্তা হচ্ছে, সম্পদের ঘাটতি মোকাবেলা এবং বাড়তি সম্পদের যোগানের জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে:

১. অভ্যন্তরীণ সম্পদের নতুন উৎস অনুসন্ধান

উন্নয়নশীল সম্পদের নতুন উৎস খুঁজে বের করা এবং এর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি চলমান প্রক্রিয়া। কিন্তু আমাদের মত দরিদ্র ও সীমিত ভূমির দেশে এই প্রক্রিয়া ব্যপক মাত্রায় কার্যকর নয়। রাষ্ট্র যদিও নতুন কর আরোপ, কর বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে; স্থানীয় পর্যায়ে এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত দূর্বল। স্থানীয় সরকার খুব কমই নতুন কর আরোপ, কর বৃদ্ধি করতে পারে। স্থানীয় সংগঠনসমূহও খুব কমই স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে।

২. অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাস

অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাস এর মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধির ধারণা আমাদের মত দরিদ্র দেশে খুব বেশী কার্যকর নয়। কেননা উন্নয়নশীল দেশের জনগণ যে সর্বনিম্ন চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে সেই চাহিদা হ্রাস করার মাধ্যমে নতুন সম্পদ সৃষ্টি প্রায় অসম্ভব। কেননা তাদের ভোগের মাত্রা খুবই কম। আবার নতুন সম্পদ তৈরির জন্য যে কাঁচামালের প্রয়োজন হবে তা আবার চাহিদার তালিকায় স্থান পাবে।

৩. বহিরাগত সম্পদের প্রবাহের সৃষ্টি

উন্নয়নশীল দেশের মানুষের সামাজিক চাহিদা পূরণের অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে বহিরাগত সম্পদের নতুন প্রবাহ সৃষ্টি। বিশেষত স্থানীয়

সরকার ও স্থানীয় সংগঠনসমূহও বহিরাগত সম্পদের নতুন প্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।

সম্পদ সমাবেশীকরণ এ্যপ্রোচ

সম্পদ সমাবেশীকরণ তত্ত্ব খুব বেশি রক্ষণশীল তত্ত্ব নয়। এর ভিত্তি হলো মাইক্রো অর্থনীতি এবং সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব। সম্পদ সমাবেশীকরণ তত্ত্বের জনক Mc Carthy এবং Zalad ৭০ এর দশকে। তবে ৮০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই তত্ত্ব যুক্তরাষ্ট্রে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যদিও এই তত্ত্বের সেরকম কোনো পরিষ্কার সংজ্ঞা পাওয়া যায় না তবে সম্পদ সমাবেশীকরণ তত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন লেখা পর্যালোচনা করে এর কিছু প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। যখন সমাজের সমষ্টিগত প্রয়োজনে বহুমাত্রিক সম্পদের সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা করা হয় তখন তাকে সম্পদ সমাবেশীকরণ বলে। সম্পদ সমাবেশীকরণের তত্ত্ব মতে, যখন সামাজিক সংগঠন বা সংস্থা কার্যকর সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পদকে সামাজিক সম্পদ হিসেবে চাহিদানুসারে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় তখন সম্পদ সমাবেশীকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। সমষ্টিগত সম্পদের মধ্যে থাকতে পারে অর্থনৈতিক সম্পদ, মানব সম্পদ, সরকারী সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, সামাজিক মূল্যবোধ, জ্ঞান, শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি। সম্পদ সমাবেশীকরণের তত্ত্বেও মূল বার্তা হচ্ছেঃ

১. সম্পদ সমাবেশীকরণের লক্ষ্যে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সমষ্টিগত প্রচেষ্টাকে সমাজিক অন্দোলনে রূপ দেয়া প্রয়োজন।
২. সমষ্টিগত বা জনগোষ্ঠীভিত্তিক সম্পদ ব্যক্তির চাহিদা পূরণে সক্ষম
৩. ব্যক্তিগত সম্পদও সমষ্টির চাহিদা পূরণে সক্ষম হতে পারে
৪. জ্ঞান ও দক্ষতাও সম্পদ। জ্ঞান, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-এগুলোও সম্পদ। সামাজিক সম্পদ অর্থনৈতিক সম্পদ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম
৫. সামাজিক আন্দোলন এমন কিছু নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম যা সম্পদ সমাবেশীকরণকে সহায়তা করে আবার নিরুৎসাহিতও করে।

সম্পদ সমাবেশীকরণের প্রবাহ চিত্র

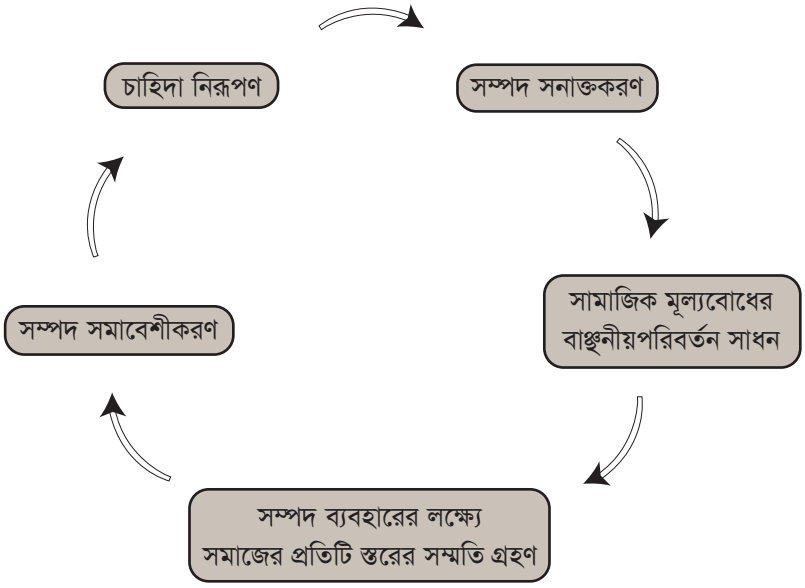

সম্পদ সমাবেশীকরণে নেতার ভূমিকা

একজন নেতাই পারেন সমাজের সম্পদগুলো সনাক্ত করে সমাজের চাহিদানুসারে সামাজিক উন্নয়নে সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে, আর এর জন্য সামাজিক মূল্যবোধের যে পরিবর্তন সাধন বাঞ্ছনীয় তা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করতে। সমাজের মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে হবে সম্পদ সমাবেশীকরণে অংশগ্রহণ করতে। কারণ ব্যক্তি পর্যায়ে মানসিক অনুমতি ব্যতীত সামাজিক পর্যায়ে সম্পদ সমাবেশীকরণ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। নেতা জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য একাধিক প্রকল্প পরিচালনা করতে পারেন, কিন্তু তিনি সফল হবেন তখনই যখন সফলতার সাথে জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে সক্ষম হবেন। যখন জনগোষ্ঠীর সকল ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পদ সমাবেশীকরণে অংশ নেবে, তখনই সমাজের উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। তাই নেতার প্রধান কাজ হলো সমাজের মূল্যবোধ, শিক্ষা, জ্ঞান এমনভাবে পরিবর্তন করা যেন জনগোষ্ঠী নিজের সম্পদের সর্বাধিক সফল ব্যবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়।

একজন নেতা যেভাবে সম্পদ সমাবেশীকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন:

১. জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

২. জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্পদের চাহিদা নির্ণয় করতে হবে।

৩. প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান নিশ্চিত করতে তাঁকে অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ সকল উৎস তিনি খুজে দেখতে হবে।

৪. সম্পদের অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ সকল উৎসকে জনঅংশগ্রহণভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্পদের চাহিদা তিনি নিরূপন করতে পারেন জানতে হবে।

৫. উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পদ্ধতি, এর ফলাফল এবং দীর্ঘমেয়াদী সুফল সকলকে জানাতে হবে।

৬. উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর উপায় উদ্ভাবন করতে তিনি সচেষ্ট হবেন, যা সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করে।

৭. সামাজিক সম্পদ এর সর্বোচ্চ উৎকর্ষতা আনায়নে চেষ্টা করতে হবে।

৮. সম্পদ সমাবেশীকরণের লক্ষ্যে সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় জনগোষ্ঠীর সকলের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে হবে।

৯. ব্যক্তিগত সম্পদ সমষ্টির ব্যবহারে সকলকে উৎসাহিত করতে হবে।

১০. সম্পদ সমাবেশীকরণ প্রচেষ্টাকে আন্দোলনে রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সম্পদ সমাবেশীকরণে নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ

প্রতিটি কমিউনিটির কিছু স্থায়ী সম্পদ থাকে যাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তার ভবিষ্যৎ। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্নয়নশীল দেশগুলো তার সম্পদের সর্বাধিক সঠিক ব্যবহার করতে সক্ষম হয় না, কখনও বা সঠিক জ্ঞানের অভাবে আবার কখনো সুযোগের অভাবে কেননা যেকোনো কাজ করতে

গেলেই নানা বাধা এসে পথ রুদ্ধ করে ঠিক তেমনি সম্পদ সমাবেশীকরণেরও কিছু বাধা বা চ্যালেঞ্জ আছে। যেমন-

১. সরকারী প্রতিষ্ঠান এমনকি অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে আগ্রহী নাও হতে পারে।

২. জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্পদের চাহিদা নির্ণয় সহজ নয়।

৩. জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্পদের চাহিদা সম্পর্কে বহিস্থ উৎসের আস্থা অর্জন সহজ নাও হতে পারে।

৪. অভ্যন্তরীণ নতুন উৎস থেকে সম্পদ আহরণ জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তর থেকেই বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

৫. সম্পদ সম্পর্কীত জনগোষ্ঠীর এমনকি প্রতিষ্ঠানসমূহের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনায়ন।

৬. উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্পদের কার্যকর ও সাশ্রয়ী ব্যবহারে সকলেই আগ্রহী নাও হতে পারে।

৭. জনগোষ্ঠীর সকলেই এমনকি অনেক প্রতিষ্ঠানও ব্যক্তিগত সম্পদের সামাজিক ব্যবহারে অজ্ঞতাপ্রসূত কারণে অসহযোগিতা করতে পারে।

৮. সম্পদ সমাবেশীকরণের লক্ষ্যে সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় জনগোষ্ঠীর সকলের অংশগ্রহণ।

৯. সম্পদের ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

১০. সম্পদ সমাবেশীকরণ প্রচেষ্টাকে আন্দোলনে রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ ও এর সফলতা আনায়ন।

সামাজিক উন্নয়নের বহু শর্ত রয়েছে তার মধ্যে সম্পদের সঠিক ও সর্বাধিক ব্যবহার একটি শর্ত যা অর্জন করার একটি সম্ভাবনার নাম হলো সম্পদের সমাবেশীকরণ। বিশ্বের নানা দেশ এই ধারণাটি কাজে লাগিয়ে সফলতা পেয়েছে তাই আশা করা যাচ্ছে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্যও এই ধারণা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নেতার ভূমিকা

সামাজিক নেতার ভূমিকা সর্বব্যাপী। বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। দেশের বেশীরভাগ এলাকা প্রায় প্রতি বছর, এমনকি একই বছরের বিভিন্ন সময়ে দুর্যোগ কবলিত হয়। আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করে; যে কারণে দুর্যোগের আঘাতে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয় সীমাহীন। দারিদ্র কবলিত বাংলাদেশের মানুষ যখন দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে জীবন ও সম্পদ রক্ষার লড়াইয়ে রত হয়, তখন আমাদের যৌথ পরিবার ও যৌথ সমাজের ধারণা সমৃদ্ধ বহুসংখ্যক মানুষ তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে। মানুষের প্রতি মানুষের এই সহানুভুতি ও সহযোগিতা অধিকতর ফলপ্রসু হয়ে উঠতে পারে, যদি তা হয় পরিকল্পিত ও সমন্বিত। পরিকল্পিত ও সমন্বিত সামাজিক প্রয়াসের জন্য প্রয়োজন দুরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সামাজিক নেতা যদি কার্যকর ভূমিকা রাখতে চান তাহলে তাকে দুর্যোগ ও এর ঝুঁকি নিরসন সর্ম্পকে জানতে হবে।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সামাজিক নেতার ভূমিকা

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সামাজিক নেতার ভূমিকা অপরিসীম। যখন কোন আপদ নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে আঘাত করে এবং ঐ জনগোষ্ঠীর তা মোকাবেলা করার সামর্থ থাকে না, তখনই দুর্যোগ দেখা দেয়। অর্থাৎ "জনগোষ্ঠীর মোকাবেলা করার সক্ষমতা" এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আপদ থেকে দুর্যোগে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেন। "জনগোষ্ঠীর মোকাবেলা করার সক্ষমতা" অর্জনে সামাজিক নেতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নেতা যেভাবে তাঁর নিজ সমাজকে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারেন, তা নিম্নরূপ:

১. দুর্যোগপূর্ব কালে: দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই সামাজিক সমাবেশীকরণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। সমাবেশীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার সকল স্তরের মানুষ কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়। কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিজেরাই ঐক্যবদ্ধ হয়, কর্মসূচী

গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে ওঠে। দুর্যোগ এমন এক পরিস্থিতি যা থেকে উত্তরণের জন্য পারিবারিক ও সামাজিক উদ্যোগ প্রয়োজন। সুতরাং নেতা তাঁর নিজ জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। দুর্যোগ প্রতিরোধে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নেতা যা করতে পারেন:

ক. মানুষকে দুর্যোগের ঝুঁকি, ক্ষতিকর প্রভাব ও এর মোকাবেলায় মানুষকে সচেতন করে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন, অন্যের গৃহিত কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে পারেন। আমাদের সমাজের অনেক মানুষ এখনো দুর্যোগকে প্রকৃতি প্রদত্ত অভিশাপ কিংবা নিয়তির বিধান হিসাবে বিবেচনা করে, যা সঠিক নয়। দুর্যোগ প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট এটা সত্য, তবে অপ্রতিরোধ্য নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কোন আপদ যখন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে আঘাত করে এবং ঐ জনগোষ্ঠীর তা মোকাবেলা করার সামর্থ থাকে না, তখনই মানুষের যে দুর্ভোগ দেখা দেয় তাই দুর্যোগ। সুতরাং নেতা যা করতে পারেন তা হচ্ছে, দুর্যোগ মোকাবেলায় মানুষকে সনাতন ধারণা থেকে বের হয়ে এসে সক্ষমতা অর্জনে সচেতন করা, ঐক্যবদ্ধ করা ও সচেষ্ট করা।

খ. দুর্যোগ মোকাবেলার প্রাথমিক ইউনিট, পরিবার। পরিবার থেকেই দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের কার্যক্রম শুরু করা প্রয়োজন। একজন নেতার উচিৎ নিজের পরিবার থেকে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের কার্যক্রম শুরু করা। এরপরে তিনি অপরাপর মানুষকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্র হতে পারে, দর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী কার কী করনীয় তা জানানো।

গ. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সরকারী বিভাগসমূহের ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষত দুর্যোগ-পূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে কৃষি, স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল, পশু সম্পদ বিভাগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে এ সকল বিভাগের কী কী কার্যক্রম রয়েছে তা মানুষকে জানানো, এ সকল সেবা গ্রহণে তাদেরকে উদ্যোগী করে তোলার ক্ষেত্রে নেতা ভূমিকা রাখতে পারেন।

ঘ. সরকারী দপ্তরসমূহের ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম সক্রিয়করণে এ্যাডভোকেসি: সরকারী বিধান অনুসারে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিভাগসমুহের যেভাবে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে তাদেরকে উদ্যোগী করে তুলতেও নেতা ভূমিকা রাখতে পারেন।

ঙ. আমাদের দেশে সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। যে কোন জরুরী মুহুর্তে প্রতিবেশীরাই এগিয়ে আসেন সর্বাগ্রে। আমাদের সমাজে অনেকেই আছেন যাঁরা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দুর্যোগ মুহুর্তে কাজ করে থাকেন। নেতা যেহেতু সহজেই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ উদ্বুদ্ধ ও করতে পারেন। তিনি এ ধরনের স্বেচ্ছাসেবী মানুষকে সনাক্ত ও উদ্বুদ্ধ করবেন।

চ. যে কোন দুর্যোগে শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধিরা অত্যাধিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয় এবং খুব সহজেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। কেননা শারীরিক সীমাবদ্ধতাহেতু তাদের বিপদাপন্নতা খুবই বেশী এমনকি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নারীর তুলনায় বেশী। শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধিরা সার্বজনীনভাবে বিশেষ অধিকারের দাবীদার। অধিকাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিই জরুরী মুহূর্তে একাকী পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারেন না। আবার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে যে সকল পদক্ষেপ নেয়া হয়, তা সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করেই তৈরী করা হয়; যেমন, সতর্ক বার্তা প্রচারের সময় যাঁরা শ্রবণ প্রতিবন্ধী তাঁদের কথা, কিংবা নিরাপদ আশ্রয়স্থানে অক্ষমদের চলাচলের কথা বিবেচনা করা হয় না। ক্ষয়ক্ষতি জরিপ ও চাহিদা নিরূপণ প্রক্রিয়াতেও তাঁদের কথা প্রায়শঃই বিবেচনা করা হয় না। শারীরিক সীমাবদ্ধতা থাকলেও তাঁরা মানুষ এবং মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের আমাদের এই পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য তাঁদের যে পরিবেশ প্রয়োজন তা আমরা নিশ্চিত করতে পারিনি; যার দরুণ তাঁদের জীবন অনেক কষ্টকর হয়ে পড়েছে। জরুরী মুহূর্তে তাঁদের জন্য বিশেষ সুবিধা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক নেতৃত্বের ভুমিকা অপরিসীম। নেতা তাঁর নিজ জনগোষ্ঠির মাঝে এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারেন যে, মানুষ

হিসেবে এই পৃথিবীতে তাঁদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকার আছে এবং জরুরী মুহূর্তে তাঁদের বিশেষ কিছু অধিকার আছে। নেতা এ-বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন, অন্যের গৃহিত কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে পারেন।

জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা

একটি আসন্ন জরুরী পরিস্থিতি সম্বন্ধে পূর্বানুমান করা এবং তা মোকাবেলা করার লক্ষ্যে একজন নেতাকে অবশ্যই জরুরী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পদ্ধতিগতভাবে পরিচালনা করতে হবে। একটি কার্যকর জরুরী ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি ও পরিচালনায়ও নেতৃত্বের ভূমিকা অপরিসীম।

জরুরী ব্যবস্থাপনার জন্য নেতৃত্বের কাঠামো

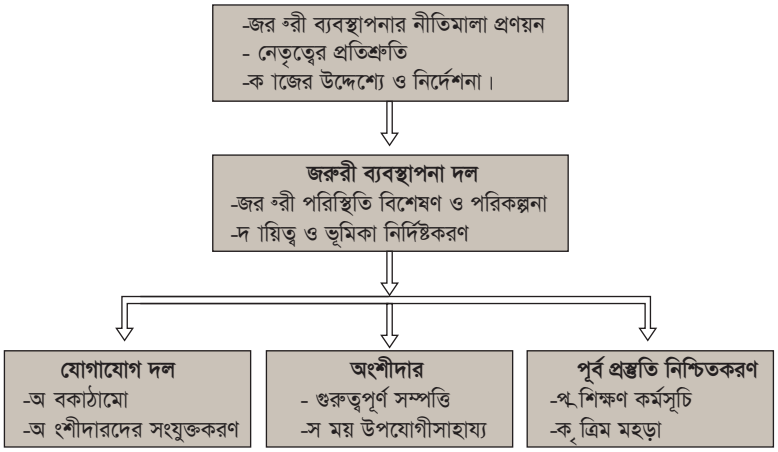

জরুরী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রথম ধাপটি হচ্ছে, জরুরী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যা সংগঠনের দর্শন এবং মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হওয়া উচিৎ। নেতৃত্বের উচিত ব্যবস্থাপনার উচ্চ পর্যায়ের টিমকে জরুরী ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা; যার মাধ্যমে একটি সংগঠন বিভিন্ন পর্যায়ের জরুরী পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করতে পারবে।

এ পর্যায়ে দ্বিতীয় ধাপটি হচ্ছে, একটি জরুরী ব্যবস্থাপনা দল গঠন করা; যার মাধ্যমে একটি সংগঠন বা তার যেকোনো ইউনিট সম্ভাব্য জরুরী পরিস্থিতি চিহ্নিতকরণ এবং জরুরী পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দলের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য চিহ্নিতকরণ। এক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা হচ্ছে একটি দলকে ক্ষমতা প্রদান করা যাঁরা জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলায় সংগঠন, সম্পদ ও জনগোষ্ঠীর চাহিদা ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করবেন ও নেতৃত্বকে মাঠ পর্যায়ের চাহিদা এবং সম্ভাব্য করণীয় জানাবেন।

নেতৃত্বের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে কার্যকর এবং বিস্তৃত যোগাযোগ কৌশল নিশ্চিত করা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা (এমনকি জরুরী কিংবা দুর্যোগকালীন মুহূর্তে) যার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। বহিঃস্থ সংগঠনের সাথে অংশীদারীত্ব প্রতিষ্ঠা নেতৃত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ যার মাধ্যমে জরুরী পরিস্থিতিতেও নিজস্ব সংগঠনের জন্য ভৌত সম্পদ ও জনবলের সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।

এছাড়াও নেতৃত্বের অন্যতম কাজ হচ্ছে ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যার মাধ্যমে একটি সংগঠন এবং তার সকল জনশক্তি একটি জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে।

জরুরী পরিস্থিতি নিরসনের চূড়ান্ত পরীক্ষা

জরুরী পরিস্থিতি সাধারণত ভীতিমূলক উপাদানের দ্বারা বিশেষায়িত করা হয়ে থাকে। এ কারণে জরুরী পরিস্থিতি নিরসনের উপর গুরুত্বারোপ করাকে জরুরী ব্যবস্থাপনার একটি উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যখন কোনো জরুরী পরিস্থিতি নিরসনে কোনো নীতিই কাজে আসেনা তখনও কিছু বাস্তব পরিকল্পনা এবং সাধারণ পূর্বপ্রস্তুতি একটি উদ্ভূত জরুরী পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে সাহায্য করে থাকে।

জরুরী ব্যবস্থাপনা যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি উচ্চ মানের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে একটি সংগঠনের উদ্দেশ্যকে বিবেচনাপূর্বক যেকোনো জরুরী পরিস্থিতি নিরসনে সুনির্দিষ্ট দিক্কনি র্দেশনা দিতে পারে। একটি সংগঠন মূল্যবোধ ও নেতৃত্বের বিশ্বাসে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট জরুরী

পরিস্থিতির ব্যাপারে সেই সংগঠনের অবস্থানকে নির্ধারণ করে। এবং সেই মূল্যবোধের সাধারণ ধারণা থেকেই সকল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

পূর্বপ্রস্তুতির মাধ্যমে নেতৃত্ব "কীভাবে এবং কী করতে হবে" এই সম্বন্ধে নিশ্চিত হন। কিন্তু যখন জরুরী পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হয় তখন নেতৃত্ব "কীভাবে এবং কী করতে হবে" এর পরিবর্তে "কীভাবে হবে" তাঁর উপর গুরুত্বারোপ করেন।

জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করা একজন নেতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

জরুরী পরিস্থিতি সম্বন্ধে পূর্বানুমান করা কৌশলগত পরিকল্পনা এবং জরুরী ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু প্রতিটি স্বতন্ত্র জরুরী পরিস্থিতি দক্ষ নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হতে হবে যে তার জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার করবে এবং সংগঠনের অন্যান্যদেরকেও এ বিষয়ে অবহিত করবে যার মাধ্যমে সংগঠনের মাঝে সংগঠনগত পরিবর্তন সাধিত হবে।

উপরের চিত্র থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, কীভাবে একটি চক্রাকার প্রক্রিয়ায় জরুরী পরিস্থিতি নির্ধারণ ও এদের ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এবং এই জরুরী পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনাকালীন জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে একে ঐ সংগঠনের পরিবর্তনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যার মাধ্যমে একটি সংগঠন তার সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠে এবং নিজেকে আরও দক্ষ এবং উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলে।

একটি আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত এবং অপরিকল্পিত ঘটনা একটি সংগঠনের মাঝে অস্থিতিশীলতা তৈরী করে যাকে জরুরি পরিস্থিতি বলা হয়। জরুরী পরিস্থিতি সাধারণত ক্ষুদ্র পরিসরে উদ্ভূত হয় এবং কর্মক্ষেত্রে বিশাল অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করে।

জরুরী পরিস্থিতিতে নেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, যেমন-

- আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তা প্রদর্শনের মাধ্যমে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়া এবং পরিস্থিতির পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করা।
- সহযোগীদের উপর নেতার কাঙ্ক্ষিত নিয়ন্ত্রণ এবং নেতাকে তার চারপাশের ঘটনা সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত থাকতে হবে। নেতাকে মনে রাখতে হবে, প্রাথমিকভাবে যেকোনো ক্ষুদ্র বিষয়ও পরবর্তীতে বিরাট আকার ধারণ করতে পারে। জরুরী কোনো ক্ষুদ্র ঘটনাকেও উপেক্ষা করা যাবেনা এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় অন্যের অপেক্ষা করা সমীচীন নয়।
- যেকোনো জরুরী পরিস্থিতি সর্ম্পকে পূর্বউপলব্ধি করার ক্ষমতা একজন নেতার থাকতে হবে, সে অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে ও তাঁকে সচেতন থাকতে হবে এবং তাঁর সহকর্মীদের সে বিষয়ে সতর্ক রাখতে হবে। যেকোনো জরুরী পরিস্থিতি সর্ম্পকে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ একজন নেতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।
- জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলায় নেতা তাঁর সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা প্রয়োগসহ কর্মক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করবেন। নেতা সহকর্মীদের নিজেদের মধ্যে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ প্রদান করা যাতে জরুরী পরিস্থিতি নিরসনে সবচেয়ে ভালো সমাধানে পৌঁছানো যায়।
- জরুরী পরিস্থিতি সহকর্মীদের বিচলিত হতে বারণ করা। তাদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সাহস প্রদানের মাধ্যেমে কঠিন সময়ের মুখোমুখী হতে উৎসাহিত করা। সহকর্মীদের একক সত্ত্বা হিসেবে কার্যসম্পাদনের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করা।
- একজন নেতার উচিত প্রতিনিয়ত সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করা। সহকর্মীদের বোঝানো যে নেতা তাদেরই অংশ।

সহকর্মীদের জরুরী পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা। কারণ জরুরী অবস্থা প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

- সহকর্মীদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে শেখানো এবং জরুরী অবস্থা সম্বন্ধে কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি ব্যক্তিকে অবগত করা।
- সংগঠন পরিচালনার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম এবং ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করা ও সঠিক তথ্যের মাধ্যমে বিকল্প পরিকল্পনার উন্নয়ন সাধন করা।
- সংগঠন হতে নেতিবাচকতা দূর করা। সহকর্মীদের নিজেদের উপর এবং সংগঠনের উপর বিশ্বাস রাখতে সহায়তা করা। কারণ জরুরী পরিস্থিতিতে একজন আরেকজনের উপর বিশ্বাস রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারা ভুল তথ্য বা গুজব ছড়ায় এবং সংগঠনের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- অংশীদার, অন্যান্য সংগঠন এবং বিশেষ করে গণমাধ্যমকে উপেক্ষা না করা। সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে কার্যকর যোগাযোগ রাখা। উল্লেখ্য, জনগণ উপেক্ষিত হলে পরিস্থিতি আরও বিপদজনক হতে পারে। সে কারণে অন্যান্য সংগঠনের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের কাছে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চাওয়া।
- আশাহত না হওয়া। নেতা নিজেকে তাঁর দলের অন্যান্য সদস্যের জন্য সহায়তার একটি শক্ত ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যেন কর্মীরা নেতার পেছনে এসে দাঁড়াতে পারে।
- নেতার উচিৎ যত দ্রুত সম্ভব জরুরী পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা। নিজে ঝুঁকি নিতে শেখা ও অন্যান্যদের ঝুঁকি নিতে শেখানো এবং প্রত্যেকের দায়িত্বসমূহ সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া।

পরিশেষে বলা যায় যে, যখনই একটি সংগঠন জরুরী পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসে তখন একজন নেতার দায়িত্ব হচ্ছে জরুরী পরিস্থিতি থেকে আহরিত জ্ঞান সকলের সাথে বিনিময় করা যেন সহকর্মীরাও একই ধরনের ভুল পুনরায় না করেন। নেতাকে কঠোর পরিশ্রম করার মাধ্যমে সংগঠনের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করতে হবে ও পরিবর্তন এবং নতুন পরিস্থিতির সাথে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

সমাপ্ত